যৌগিক সাধন

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিক, ১৩২৮
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস,
চন্দননগর।

—:০:—

যোগের উদ্দেশ্য

যোগের ফল মুক্তি, তোমরা চিরকাল এই কথাটি শুনিয়া আসিতেছ। আমি যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি তোমরাও যদি সেই পন্থায় চলিতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে মুক্তি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একটু বদলাইতে হইবে। আমি মুক্তি অর্থে 'লয়' বুঝি না। লয়কে অন্বেষণ করা উচিত নয়, তাহার প্রার্থনা করাও উচিত নয়। ভগবানের যখন ইচ্ছা হইবে, এইভাবে শুধু তাহার অপেক্ষা করা উচিত। গোডা হইতে যদি লয়কেই তোমার লক্ষ্য বলিয়া ধর তবে আত্মার পরিণামকে তুমি খণ্ডীকৃত করিয়া লইতেছ, ভগবানের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে তোমার ইচ্ছারই প্রতিষ্ঠা করিতেছ। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি অর্থে অজ্ঞান হইতে মুক্তি, অহংকার হইতে মুক্তি, সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি। তারপর মনে রাখিও মুক্তিই যোগের একমাত্র বা শেষ কথা নয়। যোগের চারিটি পর্ব্ব বা অঙ্গ—মুক্তি তাহার একটি। এই চারিটি অঙ্গ হইতেছে—১। শুদ্ধি, ২। মুক্তি, ৩। ভুক্তি, ৪। সিদ্ধি। শুদ্ধি ও মুক্তি যোগের প্রথমপাদ মাত্র। উদ্দেশ্য ক্ষেত্রটিকে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া তোলা, কিন্তু যোগের পূর্ণ সার্থকতা ভুক্তি ও সিদ্ধি লইয়া। সমস্ত পুরাতন অভ্যাস, গতানুগতিক অন্ধসংস্কার হইতে অব্যাহতি লাভ

করিতে হইবে। কিন্তু কি জন্য ? অন্য প্রকার অভ্যাস, অন্য প্রকার সংস্কার —ভগবৎ-প্রেরণার যে অভ্যাস, যে সংস্কার, তাহাতেই পরিপূরিত হইবার জন্য। মানুষভাব হইতে মুক্ত হও, দেবভাব পাইবার জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগকেই চিনিয়া লইও—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। আর জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে, প্রেমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে তুমি যখন পূর্ণ, ভগবানেরই ন্যায় তুমি অন্তরে যখন স্বরাট্, বাহিরে যখন সম্রাট্ তখনই তোমার যোগের সিদ্ধি।

এই কথাটিই তোমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। যে মূল ভাবটি আমার যোগকে পরিচালিত করিয়াছে সে ভাবে তোমরা অনেকেই ঠিক অভ্যস্ত নও। বৈরাগ্যকেই যদি তোমরা সকল জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ বলিয়া মনে কর তবে আমার শাস্ত্রে তোমাদের তৃপ্তি হইবে না। বৈরাগ্য সনাতন ভাব নহে। আমি ত মনে করি বৈরাগ্য মনের একটি সাময়িক অবস্থামাত্র। সাধনার একটি বিশেষ পর্য্যায়েই ইহার প্রয়োজনীয়তা। যখন কোন পুরাতন দৃঢ়মূল সংস্কারকে কেবল অভ্যাস বা চেষ্টা দ্বারা দূর করা যায় না, ভগবান্ তখন এই বৈরাগ্যকে জাগরিত করিয়া সেই সংস্কারের নিরসন করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত চিত্ত কিছুতেই নিশ্চল হয় না, মন কোনরূপে শান্ত হয় না, সে পর্য্যন্ত এই চাঞ্চল্য, এই অশান্তি—জ্ঞানকে, ভগবৎ-প্রেরণাকে সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে, ইহাকে অপ্রতিহতভাবে কার্য্যকরী হইতে দেয় না। এবং তখনই হয় অভ্যাস, না হয় বৈরাগ্য দ্বারা এই বন্ধন কাটাইতে হয়। কিন্তু মন যখন স্থির হইতে শিখে, বিষয়ের সম্পর্কে আসিলে যখন উহার মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারের আন্দোলন আর খেলে না, তখন জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে ; শক্তি স্বপ্রেরণাবশেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তোমাদের আর প্রকৃতপক্ষে কোন সাধন নাই, আছে কেবল সিদ্ধির ক্রমবর্দ্ধনশীল বিকাশ। সে সিদ্ধি কোন পূর্ব্বকল্পিত বা স্থিরনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে

না। প্রকৃতির যে সহজসিদ্ধ নিয়মবশে মানুষ চলা ফেরা করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে সেই স্বতঃস্ফুরিত নিয়মবশেই তোমাদের যোগ নিয়মিত, পরিচালিত হইবে, প্রকৃতির অন্তঃস্থ অদম্য শক্তি বলেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। চেষ্টাসাধ্য অভ্যাসেরই বা তখন প্রয়োজন কি, বৈরাগ্য-বিমুখতারই বা সার্থকতা কি? সব রকম আসক্তিই পরিত্যাগ করিবে। বৈরাগ্যের প্রতি যে আসক্তি সেও আসক্তি। লোভ যেমন পরিবর্জ্জনীয়, বৈরাগ্যও তেমনি পরিবর্জ্জনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে, অবস্থাবিশেষে উভয়ই প্রয়োজনীয় আবার উভয়ই অনিষ্টকর।

আবার যদি তুমি বৌদ্ধভাবের ভাবুক হইয়া বল যে জগৎ অর্থই দুঃখ, কোন না কোন রকম অবসান বা নির্ব্বাণই পরম পুরুষার্থ অথবা মায়াবাদী-দিগের সহিত একমত হইয়া বলিতে থাক যে জগৎ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই আমরা জগতে আসিয়াছি, তবে আমি তোমাদিগকে আবার বলি আমার পন্থা তোমাদিগের জন্য নহে, অন্যত্র তোমরা দীক্ষালাভ কর। আমি বৈদান্তিক বটে কিন্তু ততোধিক তান্ত্রিক। আমি জানি এই জগৎ আনন্দ হইতেই উদ্ভূত, আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত, আনন্দ হইতে আনন্দেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বৈদিক দ্রষ্টাদিগের জ্ঞানই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। আনন্দ ও শক্তি এই দুইটি সত্যের উপরই সকল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ ও দৌর্ব্বল্য উহাদের বিকার মাত্র। তাহার মূল অজ্ঞান। যে মহতে, যে সত্যম্ ঋতম্ বৃহতে আমাদের প্রকৃত সত্তা তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অজ্ঞান আসিয়া তাহাকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমি জানি বিকার বিকার মাত্র, শাশ্বত নহে, সঙ্কীর্ণ দেশ কালেই আবদ্ধ ও ততটুকু হিসাবে সত্য। উহার বিকাশ এই কলিযুগেই, উহার লীলা প্রধানতঃ আমাদের এই পৃথিবীতেই। এই দুঃখ ও দৌর্ব্বল্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে হইবে, দেশের ও কালের যে সঙ্কীর্ণ কোণটুকুতে তাহারা আশ্রয়

লইয়াছে তাহা হইতেও উহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ব্যক্তিগত হিতার্থে, মানবজাতির হিতার্থে এই পৃথিবীর উপর দেবলোকেরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কলির অবসান করিয়া সত্যযুগকেই স্থাপনা করিতে হইবে। যে মতবাদ জগৎকে দুঃখময়ই বলিয়া জানে, মানুষকে সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ হইতে বিমুখ হইতে বলে, মানুষকে শিখায় যে নৈষ্কর্ম্ম্য ও বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র পন্থা, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আমি তাহাতে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করি না। ভগবান্ স্বয়ং মঙ্গলময় দোষদ্বেষহীন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার রূপ এই যে সৃষ্টি তাহা কেবল অমঙ্গলেরই নিদান, সকল দোষেরই বাসস্থান —এ কোন্ যুক্তি, এ কোন্ জ্ঞান আমি বুঝিয়া পাই না। আমি কথনই স্বীকার করিব না, জীবন একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন, শূন্যগর্ভ মৃগতৃষ্ণিকামাত্র। এ জ্ঞান আমি বৈদিক ঋষিদিগের মুখ হইতে পাই না। আমার নিজের উপলব্ধির সহিতও ইহার কোন সাদৃশ্য দেখি না। আমার নিজের উপলব্ধি প্রতিপদেই আমাকে দেখাইয়া চলিয়াছে সৃষ্টি কি মহৎ সত্য, কি শাশ্বত আনন্দে ইহার প্রতিষ্ঠা, কি পরাজ্ঞানে ইহা সদা বিধৃত। আমার উপলব্ধি আমাকে সতত শিক্ষা দিয়াছে সৃষ্টির এই বিরাট কর্ম্মস্রোতের মধ্যেই থাকিতে, আপনার কর্ম্ম-প্রেরণাসকলকে কেবল বাসনানির্ম্মুক্ত করিয়া নিখিল কর্ম্মসাগরেই মিশাইয়া দিতে; কর্ম্মের প্রেরণাকে নষ্ট করিতে সে বলে নাই। বস্তুতঃ আসক্তিহীন কর্ম্মী—গীতার 'নিষ্কাম কর্ম্মী'—যে জ্ঞানে উদ্ভাসিত, যে আনন্দে পরিপ্লুত, যে পূর্ণতার আধার, সে জ্ঞান, সে আনন্দ, সে পূর্ণতা কর্ম্মত্যাগী উদাসীন কোথায় পাইবে? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন,—

"জগতে কেহ বা কর্ম্ম শিক্ষা দেয়, কেহ বা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয়, আমি কিন্তু যাহারা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয় সে দুর্ব্বলচেতাদিগের মতাবলম্বী নহি"।

বিশ্বধারয়িতা দেবকুল যে ভাবে তাঁহাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সেই মহৎ আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। প্রাকৃতিক শক্তিসঙ্ঘের পশ্চাতে গ্যেতে (Goethe) যে আত্মপ্রতিষ্ঠ শান্তি, যে উদার ধৈর্য্য, যে শ্রান্তিহীন অটুট প্রেরণাবেগ সদা বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের কর্ম্মরাজিকেও ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার মতনই আমাদের কর্ম্মাবলী অবিরাম গতিতে ছুটিতে থাকিবে, স্বার্থ বা অহংকারের লেশমাত্র থাকিবে না, কুণ্ঠার ছায়াও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

এই আদর্শটিকেই ভাল করিয়া বুঝিও। আবার, বলিও না "আমি অজ্ঞান, আমি বদ্ধ, আমার শক্তি নাই।" আমি ত জানি, আমি যে কখন অজ্ঞান কখন দুর্ব্বল কখন বদ্ধের ভাব দেখাই তাহা দেখাই মাত্র, খেলাটি জমাইয়া তুলিবার জন্য। এ সংসারনাট্যে অভিনেতাদিগের মত দুঃখভোগের অভিনয়ই করিতেছি, বাস্তবিক আমি দুঃখভোগ করি না। দুঃখও যে আনন্দের প্রকারভেদ তাহাই উপলব্ধি করি। ইচ্ছা করিলেই এ ভূমিকা ত্যাগ করিতে পারি। সে ত আমার উপর নির্ভর করে। কে বলে আমি অধম কীট, আমিই ত ব্রহ্ম। সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি। পাপ কোথায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে? কে বলে আমি পাপী, কোথায় আমার দুঃখ? আমিইত ভগবান, সমস্ত আনন্দই আমার মধ্যে বহমান। কে বলে আমি দুর্ব্বল? সেই অনন্তশক্তিমানের সহিত আমি একাত্মা। তিনি এক, তিনিই আবার বহুধা হইয়াছেন। তিনিই অনন্ত সমষ্টি, তিনিই ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে তিনি তবু অনন্তই রহিয়াছেন। সৃষ্টির ইহাই গুপ্ততন্ত্র, ইহাই সেই উত্তমং রহস্যম্। এই সেই গুহাস্থিত অপূর্ব্ব তত্ত্ব, তর্ক যাহাকে খুঁজিয়া পায় না কিন্তু শ্রদ্ধাবানের দৃষ্টিতে যাহা স্বতঃ উদ্ভাসিত।

তোমার বৃহত্তর 'আমি', প্রকৃত 'আমি', এই 'তাঁহাকে' চিনিয়া লও। বাসনার খেলার মধ্যে মত্ত ও বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাকে পাইবে না, আবার বৈরাগ্যের দ্বারা সকল বন্ধনের একান্ত পার হইয়া গেলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না। বাসনাও চাই না বৈরাগ্যও চাইনা—আমি চাই আত্মসমর্পণ। বুঝিয়া লও তুমি একান্ত তোমারই নও। তোমার প্রকৃতি তোমার জাগতিক খেলা তাঁহারই ঈশ্বরভাব, তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই শ্রী। তোমা হইতে তোমাকে সরাইয়া ফেলিয়া তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠা কর। তোমার সব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার বুদ্ধির মধ্যে তাঁহারই সত্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, হৃদয়ে তাঁহারই আনন্দ ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হউক, কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্যকরী হউক আর তোমার শরীর তাঁহার এই সমস্ত লীলাভার বহন করিতে থাকুক। তাঁহারই ইঙ্গিতে কখন হও তুমি ঝঞ্ঝা বাত্যার ন্যায় রুদ্র, কখনও বা জ্যোৎস্নার ন্যায় হাস্যময়, কোথাও ভূমিকম্পের ন্যায় নির্ম্মম ধ্বংসকারী, কোথাও বা স্রোতস্বতীর ন্যায় কল্যাণময়ী। ভগবান্ যদি চাহেন, আকাশের মত বিরাট হইও আবার শিশিরকণাটির মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতেও কুণ্ঠিত হইও না। বাহিরে এই অনন্তমূর্ত্তি অনন্ত ভাব, এই নানাত্ব, এই বৈচিত্র্য কিন্তু অন্তরে সদা নিশ্চল শান্তি, প্রসন্ন বিমলতা, তাঁহারই সমাধিমগ্ন নিথর আত্মপ্রতিষ্ঠা—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য।

"তুমি যে দিন তোমাকে আর তোমার কর্ম্মের নিয়ন্তারূপে বোধ করিবে না, তোমার প্রকৃতির উপর সকল ভার সমর্পণ করিবে, যে দিন তুমি দেখিবে তুমি নিজে শান্ত, নির্লিপ্ত, বিশ্বপ্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার বাহিরে সব করিয়া চলিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তোমার যোগের দীক্ষা।" সেই দিন হইতে দেখিবে প্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার আধারের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া চলিয়াছে। আধারের এই পরিবর্ত্তন সাধনই সমস্ত যোগ সাধনা। তখন দেখিবে নিজে তুমি চেষ্টা করিয়া কিছু করিতেছ না, অথচ তোমার মধ্যে কত পুরাতন প্রবৃত্তি খসিয়া পড়িতেছে, কত নব নব প্রবৃত্তির উন্মেষে তোমার জীবন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের নির্লিপ্ততা—বৈরাগ্য আমি বলিতে চাই না—তোমাকে জগৎ হইতে ছাড়াইয়া লয় নাই, বরং জগতের বিরাট হইতে বিরাটতর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আধারের পরিবর্ত্তন সাধনের চারিটি স্তর। আমি বলিয়াছি উহা হইতেছে শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি। প্রথমে চাই আধারকে দোষনির্ম্মুক্ত করা, পুরাতনকে দূর করা, প্রকৃতির অন্ধ প্রবৃত্তি সমূহের খেলাকে বন্ধ করা। তাহাই হইতেছে শুদ্ধি ও মুক্তি। তৎপরে নূতনের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির জ্ঞানোদ্ভাসিত উচ্চতর প্রবৃত্তির বিকাশ ও পরিপূর্ণতা, তাহাই হইতেছে ভুক্তি ও সিদ্ধি। ক্ষেত্রটি হইতে প্রথমে আগাছা সব নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ক্ষেত্রটিকে ঝরঝরে ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। তারপর বীজবপন ও তারপর শস্যের আবির্ভাব।

এখন আধার বলিতে কি বুঝি? বুদ্ধি, মন, চিত্ত, প্রাণ ও শরীর এই পাঁচটি স্তর লইয়া জীবের আধার। এই পাঁচটি স্তরের মধ্যেই শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই তোমার পূর্ণযোগ। সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে শুদ্ধি হইতে। শুদ্ধিরও আবার আরম্ভ বুদ্ধি

হইতে। কারণ মানুষ বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিই তাহার কেন্দ্রস্থল, এ যুগে বুদ্ধির মধ্যেই সে আপনাকে স্থাপনা করিয়াছে। মানুষ বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছে সেই অনুসারেই জীবনকে ও জগৎকে গঠিত করিতে চাহে। তোমার চিন্তার গতি যেমন কার্য্যও অলক্ষিতে ক্রমে ক্রমে তদনুরূপই হইয়া পড়ে। মানবসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, বুদ্ধিরই প্রভাব তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে। বুদ্ধির উপরই মানুষকে যদি এতখানি নির্ভর করিতে হয়, তবে বুদ্ধিকে এরূপভাবে গঠিত করিতে হইবে যে তাহার উপর যেন সত্যসত্যই নির্ভর করা যায়। সকলের আগে তাই প্রয়োজন বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। বুদ্ধির দোষ কি? বুদ্ধির দোষ কূটতর্ক, বুদ্ধির দোষ কল্পনায় মায়ামরীচিকা রচনা, বুদ্ধির দোষ একদেশ-দর্শিতা। বুদ্ধি বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না—যে দিকটি সহজেই নজরে পড়ে, যাহা সহজেই বোধগম্য সেই টুকুই ধরিয়া বসে। এই খণ্ডজ্ঞানটুকুর দ্বারাই সকল বস্তু বুঝিতে চায়, এই টুকুর দ্বারাই জগৎকে পরিমাপ করিতে অগ্রসর হয়। তাহার ফলে আমরা সত্যটি হারাইয়া ফেলি, এক কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর এক প্রকার জ্ঞান আসিয়া জোর করিয়া এই সৌধটিকে না ভাঙ্গিয়া ফেলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে একমাত্র কল্পান্তস্থায়ী সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি। বুদ্ধির এই সকল দোষকেই নিরাকৃত করিতে হইবে। বুদ্ধির মুখ হইতে সেই উগ্র হিরণ্ময় পাত্রটি অপসারিত করিতে হইবে। বুদ্ধি হইবে প্রশান্ত, উদার। বুদ্ধির কাজ সৃষ্টি নয়, বুদ্ধির কাজ বুঝা। উর্দ্ধ-লোক হইতে যে জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে তাহাকে ধারণ করা, তাহার অর্থ গ্রহণ করা, তাহাকে যথাযথ প্রতিফলিত করা। বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানের আধার হইলে, বুদ্ধির শুদ্ধি হইলে মনের শুদ্ধি। মন হইতেছে অনুভূতির (sensation) ক্ষেত্র—পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহিরের জগতের সহিত সংস্পর্শে

আসিয়া যে রূপ রস প্রভৃতির পরিচয় পাইতেছে তাহারই আলেখ্য মন। মনের দোষ চাঞ্চল্য, বিষয়ের দাসত্ব। স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যদ্বারা যে জ্ঞানকে ধরিতে পারি না মন তাহাতে বিশ্বাস করে না, অথবা তাহার কোন খোঁজ রাখে না। পশুর যে জ্ঞান, যে চৈতন্য তাহা এই মনের জ্ঞান, মনের চৈতন্য। এই স্থূল অনুভূতিলব্ধ চিন্তাকেই মন আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিন্তা করিতেছে। মন কিন্তু কখন একটি বিষয়ের উপর অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকিতে পারে না—সর্ব্বদাই সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনকে তাই শান্ত করিতে হইবে—বহির্জগতের তাড়না অনুসারে উহাকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিও না, চিরাভ্যস্ত অনুভূতিরই দাস করিয়া রাখিও না। মন স্থির ও শান্ত হইলে শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান তাহা মনের নূতন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া দিবে, উহার দ্বারা বিষয়ের যে প্রতীতি তুমি পাইবে, তাহাই সত্য প্রতীতি। মনের পর চিত্ত। চিত্তের দুইটি স্তর। নীচের স্তরটি হইতেছে এক রকম ভাণ্ডার ঘর—মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে, চিন্তা করে, অনুভব করে তাহার সার-অংশটি ঐখানে রহিয়া যায়। মানুষের সকল রকম অভিজ্ঞারই শিকড় এই স্তরের মধ্যে। তুমি ভুলিয়া যাও বা না যাও একবার কোন রকমে যে বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ তাহার চিহ্ন এই চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মানুষ চিত্তের অন্তর্গত এই সকল সংস্কারেরই বশীভূত—ইহাদের দ্বারাই জ্ঞানে অজ্ঞানে পরিচালিত। চিত্তের শুদ্ধি অর্থ তাই এই সকল সংস্কারগত স্মৃতিকে দূর করা, একটা অন্ধ অজ্ঞানের ছায়া যে ইহাদিগকে ঘিরিয়া আছে তাহাকে অপসারিত করা। যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তন সংঘর্ষের ফলে তুমি আজ যাহা হইয়াছ তাহাই তোমার সব, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, চিত্তের যে এরূপ একটা তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক প্রেরণা আছে তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। অতীতের স্মৃতিকে ধারণ করাই চিত্তের একমাত্র কার্য্য নয়। ভবিষ্যতের

পূর্ব্বাভাবও যাহাতে চিত্তে প্রতিফলিত হয় সেই জন্য চিত্তকে উদার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। চিত্তের উপরের স্তরটি হইতেছে হৃদয়ের অনুভবের, ভাব-প্রবণতার ক্ষেত্র। যাহারই সহিত চিত্ত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, সে হৃদয়াবেগ দিয়া সেই সম্বন্ধটিকে অতিমাত্র তীব্র করিয়া তুলে। ফলে চিন্তার জগতে তুমি অধীর অসহিষ্ণু হইয়া পড়, গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি তোমার আর থাকে না। হৃদয়বৃত্তির জগতে লজ্জা ঘৃণা ভয় ক্রোধ প্রভৃতি বিকৃত-বৃত্তি তোমার সাহস বীর্য্য প্রেম প্রভৃতি সত্য-বৃত্তিকে কলুষিত আবরিত করিয়া রাখে। কর্ম্মের জগতে তোমার কর্ম্মের নিয়ামক হয় রাজসিক উত্তেজনা। চিত্তের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে হইবে—বিকার-জনিত যে ভাব তাহার পরিবর্ত্তে সত্য নিত্য ভাবকে স্থাপিত করিতে হইবে। চিত্তের শুদ্ধির পর প্রাণের শুদ্ধি। প্রাণ হইতেছে ভোগের ও কর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্র। বাসনাই ইহার প্রধান দোষ, এমন্ কি একমাত্র দোষ বলিলেও চলে, কারণ বাসনা হইতেই আর যাহা কিছুর উৎপত্তি। তোমার বাসনা, ইহা হইতে উহা পাইতে, কামনার ধন পাইলে তোমার হর্ষ, না পাইলে দুঃখ—শত চেষ্টার মধ্যে এইরূপে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছ। এই বাসনাকে দূর কর, কোন কিছু বাসনা করিও না, তবে তোমার চেষ্টার মত্ততাও দূর হইবে, তবেই তুমি প্রাণে সত্যশক্তি ধারণে সমর্থ হইবে, তবেই তোমার মধ্যে সত্যপ্রেরণার খেলা হইবে, সত্যপ্রেরণা তাহার তৃপ্তিকেও আপনার সঙ্গে বহিয়া আনিবে। বাসনার তিন রকম মূর্ত্তি—আসক্তি, কামনা ও রাগদ্বেষ। যখন তুমি এরূপ বোধ কর যে একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তু তোমার চাইই, না পাইলে বুঝি বিশ্ব জগৎই উল্টাইয়া যাইবে তখনই তোমার আসক্তি। আবার এরূপ উগ্রভাব দূর হইলেও, পাইবার জন্য একটা আকাঙ্খা রহিয়া যায়, সর্ব্বদাই প্রাণটি সেইদিকে পড়িয়া থাকে, ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেও সামান্য কারণেই জাগিয়া উঠে—ইহাই

হইতেছে কামনা। কামনাও দূর করিতে পারিলে থাকে তোমার রাগদ্বেষ অর্থাৎ কতকগুলি জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে তোমার সুখ বোধ হয়, আবার কতকগুলির সংস্পর্শে আসিলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর। এই রাগ-দ্বেষও দূর করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব বস্তুতে পূর্ণ সমতা পাইলে প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি। সর্ব্বশেষে হইতেছে শরীরের শুদ্ধি। রোগ জরা মৃত্যু শরীরের দোষ—শরীর ইহাদের দাস। শরীরের সংস্কার, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম-বশে তাহার রোগ হইবে, সে জরাজীর্ণ হইবে, পরিশেষে মৃত্যুর কবলে তাহার অবসান। যোগী কিন্তু জানেন স্থূল প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য নহে, তাঁহার শরীরও উহার ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র নহে। যোগীর শরীর হইবে, নিরোগ, যুবকজনোচিত স্বাস্থ্যে পূর্ণ, যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু।

আধার যদি শুদ্ধ হইল, মুক্তিও তবে উহার করায়ত্ত। মুক্তি শুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। শুদ্ধির পূর্ণতাই মুক্তি। কারণ মুক্তি অর্থ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি, আর আধারের দোষ হইতেছে এই দ্বন্দ্বের দাসত্ব। মন বুদ্ধির দ্বন্দ্ব হইতেছে সত্যাসত্য পাপ পুণ্য বোধ। তোমার সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য কি ? মানুষ আপাততঃ যাহার কোন অর্থ, জগৎ ব্যাপারে যাহার কোন সামঞ্জস্য কিছু করিতে পারে নাই তাহারই নাম দিয়াছে পাপ, অসত্য ইত্যাদি। অধিকাংশ স্থলেই সুবিধা অসুবিধার মান দণ্ড দিয়া, নিজের মনগড়া এক আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সেই আদর্শ অনুযায়ী যাহা সত্য তাহাই সত্য পুণ্যকর আর সব পাপ অসত্য। যোগীর অন্য আদর্শ নাই— তাঁহার আদর্শ ভগবান স্বয়ং। ভগবান ত সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে। তোমাকে মানুষের দ্বারা স্থিরীকৃত পাপপুণ্য সত্যাসত্য বিচার করিয়া চলিতে হইবে না—চলিতে হইবে ভগবানের প্রেরণায়। ভগবান যাহা ত্যাগ করিতে বলেন তাহা ত্যাগ করিব কিন্তু অসত্য বলিয়া নয়, পাপ বলিয়া নয়, ভগবান তাহা চাহেন না বলিয়া। ভগবান যাহা গ্রহণ করিতে বলেন তাহা গ্রহণ

করিব পুণ্য বলিয়া নয় ভগবান তাহা চাহেন বলিয়া। চিত্তের দ্বন্দ্ব বোধের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রিয় অপ্রিয় বোধ, মঙ্গল অমঙ্গল বোধ, মান অপমান বোধ এ সব হইতেছে চিত্তে অহঙ্কারের ঢেউ। সুখদুঃখ, আকাঙ্খা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাণের বন্ধন আর শরীরের বন্ধন ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণ বোধ, শরীরের সুখ ও বেদনা বোধ। এ সকলের অতীত হইয়া তোমাকে শান্ত স্থিতসত্ত্ব হইতে হইবে। ত্রিগুণের খেলা হইতে যখন তুমি মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির যখন তুমি দাস নও, যখন কোন সংস্কার দ্বারাই তুমি আবদ্ধ নও, তখন তুমি স্বরাট্, মুক্ত।

যখন তুমি শুদ্ধ ও মুক্ত, চির প্রথাগত সংস্কার সমূহকে, প্রাক্তনকে যখন তুমি কাটাইয়া উঠিয়াছ তখনই আরম্ভ হইবে তোমার মধ্যে নূতনের খেলা, মানুষভাবের পরিবর্ত্তে দেবভাবের বিকাশ। তাহার আরম্ভ ভুক্তি— অর্থাৎ সমস্তখানি আধারের মধ্য দিয়া আনন্দের ক্রীড়া। আধার ক্লেদ মুক্ত, বন্ধন মুক্ত, এখন সেই নির্ম্মল আনন্দস্রোত অব্যাহত গতিতে বহমান থাকিবে। এই আনন্দ সাগর হইতেই সকল সৃষ্টি। চিন্তায় তোমার আনন্দ সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে বাক্‌যুক্ত করিয়া। মনের অনুভূতিতে আনন্দ—সকল বস্তুর, সকল ঘটনার সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের রসভোগ করিয়া। প্রেম, মৈত্রী তোমার চিত্তকে ভরিয়া দিয়াছে। যাবতীয় সুখভোগ্য পদার্থ তোমার সজীব শক্তিপূর্ণ প্রাণকে তৃপ্ত করিতেছে। শরীরও তাহার আপন আনন্দ খুঁজিয়া লইয়াছে।

যোগের শেষ হইতেছে সিদ্ধি। সিদ্ধিই যোগের লক্ষ্য, শুদ্ধি মুক্তি ভুক্তি চাই এই সিদ্ধির জন্য। আধার যখন পুরাতনকে একেবারে দূর করিয়াছে, পুরাতনেরই মত অথবা তাহা হইতেও প্রভূততর ধন রত্নে নূতনের মধ্যে আবার সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে তখনই তুমি সম্রাট, তখনই তোমার যোগসিদ্ধি।

পরিশেষে একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। আমি যে প্রথমে শুদ্ধি, তারপর মুক্তি ও সর্বশেষে সিদ্ধি অথবা বুদ্ধি মন চিত্ত প্রভৃতি একটির পর আর একটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বলিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য। মনে করিও না তোমাদের যোগ এইরূপ একটির পর আর একটি শেষ করিয়া তবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। মানুষকে কখন এমনভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখা যায় না। সবগুলি ভাব সবগুলি বৃত্তি মানুষের মধ্যে এক সঙ্গে কার্য্য করে। যোগের চারিটি অঙ্গ পরস্পর সাপেক্ষ, মানুষের আধারের স্তর গুলির পরিবর্ত্তনসাধনও পরস্পর সাপেক্ষ। কোন একটি স্তর হইতে কোন একটি অঙ্গের মধ্য দিয়াই সাধনা আরম্ভ হইতে পারে কিন্তু কোন একটির পূর্ণতা আর সকল গুলির পূর্ণতার উপরই নির্ভর করে।

যৌগিক সাধন

উপক্রমণিকা

একটি মানবজীবনের বিশ্লেষণ করিলেই জগদ্‌রহস্যের আদিসূত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। জগতের যাবতীয় পদার্থের কারণ এক হইলেও মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদান, যাহার ভিতর দিয়া অনায়াসেই আমরা আদি কারণে উপনীত হইতে পারি। তাই মানবজীবন সাধনার জন্য। এই দুর্লভ জন্মলাভ করিয়া সাধনমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুবৃত্তি অবলম্বন করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আমাদের বিশ্বাস এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকারী। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যে আপনাকে অপদার্থ মনে করে তাহার মত অধম আর জগতে নাই।" মানুষ অপদার্থ হইতেই পারে না। তাহার ভিতর যে দেবত্ব আছে তাহা নষ্ট হইবার নহে। আজ তুমি তোমাব অসীমত্ব, তোমার দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছ বলিয়াই তুচ্ছ কারণে আপনাকে অধম জ্ঞান করিতেছ। পরন্তু সাধন অবলম্বনে আপনার আমিত্ব উপলব্ধি কর, দেখিতে পাইবে তুমি অনন্ত শক্তির যন্ত্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি মুক্ত, তুমি অমর।

সাধারণ মানবজীবন ছাড়াইয়া, যে উপায়ে বা যে প্রণালীতে আপনার-ভিতর এই দেবভাব উপলব্ধি করা যায়, তাহাকেই যোগ বলে। অতএব

যোগ শব্দ শুনিয়াই ইহা অসম্ভব বা কঠোর কষ্টসাধ্য কিছু মনে করিয়া উপেক্ষা করিও না। এক একটা মানুষ বাসনাপরবশ হইয়া অলীক 'কাঁচা আমি'র তৃপ্তি সাধনার্থ যে সকল উৎকট কার্য্য সম্পাদন করে তাহার তুলনায় 'পাকা আমি' হইবার জন্য যে কোনও প্রকার যোগসাধন অধিকতর কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

যোগ বলিতেই অনেকে প্রাণায়াম করা মনে করেন। অধুনা দেশে মহাপুরুষগণের আগমনহেতু যে ধর্ম্মের বাতাস বহিয়াছে তাহার ফলে অনেকেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু অতীতের ধর্ম্মসংস্কার এখনও প্রভাবহীন নহে; সুতরাং ধর্ম্মসাধন করিতে হইলেই পুরাতনের আশ্রয় লইতে হয় এবং এইজন্য আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি হঠযোগের অনুষ্ঠানগুলিই যোগ, এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখা চাই, যে অতীতের আবিষ্কার অতীতের জন্য। তবে তাহার প্রভাব যে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একেবারেই বিদ্যমান না থাকিবে তাহা নহে। অতীত, জাগতিক গঠনকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবর্ত্তন হইবে, অতএব যাহা দিয়া অতীতের ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল আজও যে তাহা দিয়াই উহা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কি সম্ভব?

আমাদের সমাজ, আমাদের রাজনীতিক ক্ষেত্র, আমাদের যাহা কিছু, সকলের ভিতর এমন একটা নূতনের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার পূজা পুরাতনের উপকরণে আর চলে না। এই পরিবর্ত্তন অমঙ্গলের, একথা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবানকে ঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠেন নাই, আমরা এই কথাই বলিব। ভগবান মঙ্গলময় এবং জগতের মধ্যে পূর্ণানন্দ ভোগেচ্ছায় প্রকৃতির দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশ ঘটাইয়া মরজগতেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিবেন। যাহা ঘটিতেছে তাহা এই মঙ্গল উদ্দেশ্যেই।

অতএব যে সকল উপাদানে এবং অনুষ্ঠানে আমাদের বর্ত্তমান জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সেই প্রাচীন উপাদান এবং অনু-ষ্ঠান পুনরানয়ন করিলে আমাদের সমস্ত উদ্যম যে ব্যর্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

চাই একটা নূতন প্রণালী, নূতন ভাব, নূতন অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ নূতনকে বরণ করিতে যদিও সঙ্কোচ বোধ করে, তথাপি সত্য আপনি আবিষ্কৃত হয়, নূতনের মধ্য দিয়া দিয়া আপনাকে ধরা দেয়। বর্ত্তমান যুগের বিষম সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এইরূপ একটা নূতনতর সত্যের একান্ত প্রয়োজন।

যে সকল উপায় অবলম্বনে ভারতবর্ষের আজ এই পরিণতি, ভারত-বর্ষকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে হইলে সেই প্রাচীন উপায় সকলই যথেষ্ট নহে। প্রাচীন উপায় দ্বারা আমাদের যাহা হইয়াছে তাহা অল্প নহে কিন্তু আমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। গাছ পুঁতিলেই ফল প্রসব করে। ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা ইহা নিশ্চয় পুরাতন সাধনারই ফল; এই অবস্থা মন্দ আমরা স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ যোগভূমি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাচীন সাধনারই সিদ্ধি স্বরূপ। অন্তর্জগতের বহু দুর্জ্জেয় রহস্য আজ আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু তথাপি তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। তাই আজ অসম্পূর্ণতা বর্জ্জন করিয়া আধ্যা-ত্মিক জগতে আমরা আরও কতটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা চিন্তা করি-বার দিন আসিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি হঠযোগ সাধনে কিসের পরিণতি হয়। আমরা বুঝিয়াছি রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—আমরা বুঝিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকটীই আমাদের জীবনের খণ্ড বিকাশে সহায়তা করে। আমরা জানিয়াছি একই মানবজীবনে এগুলির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। উপলব্ধি করিয়াছি আমাদের জীবন অনন্ত, আমরা ঋষির সন্তান,

আমরা জন্ম জন্ম সাধনান্তর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখনই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান আমাদের আগমনকে এই প্রথম বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়, তখনই আমরা আমাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া যাই, পরন্তু আমরা একটা আত্মবিস্মৃত মহাজাতি।

প্রথম যখন আমরা পার্থিব ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সর্ব্বাগ্রে স্থূল শরীরের উপরই আমাদের লক্ষ্য ছিল। শীততাপ, জরামৃত্যু প্রভৃতি প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়মে আমরা বদ্ধ, এইজন্য ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন আবশ্যক হইয়াছিল এবং ইহার ফলে কঠোর হঠযোগ সাধনে আমরা শীততাপ জরা প্রভৃতির উপদ্রব হইতে আমাদের শরীরযন্ত্রকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহা করিয়াই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শরীরের উপর অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াও আমাদের জ্ঞান পরিপুষ্ট হইল না। তখন ইহারও উপরের অপর একটি যন্ত্রে দৃষ্টি পড়িল; উহা প্রাণযন্ত্র—বাসনার কর্ম্মৈষণার কেন্দ্রস্থল। উহার সূক্ষ্ম গতিবিধির পরিচয় জানিবার জন্য আবার এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া বাসনার নিবৃত্তি আসে কি না? অথবা প্রাণসংযমে সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়? ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাবিধ সাধনার সৃষ্টি হইল। বাহ্য শরীরযন্ত্রের সম্যক্ জ্ঞানলাভান্তর অভ্যন্তরস্থ এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির সন্ধান পাইবার জন্য সেএক মহাসাধনার যুগ আসিয়াছিল। উহাই তান্ত্রিক সাধনা—তান্ত্রিক সাধনার সাহায্যে প্রাণের এই অদম্য শক্তির খেলা বড় সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির জ্ঞান লাভ করিয়াও সর্ব্বানন্দ লাভ হইল না। ইহারও উপরে মানস ও চিত্ত আবেগের খেলা দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত না হইলে পূর্ণ জীবন লাভ হয় না। তাই বিষয়সংযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক

নীত হইয়া মনে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই মধুর স্পন্দনে সমস্ত জীবনটাকে রাঙাইয়া তুলে কি না, অথবা এই মনই সূক্ষ্ম প্রাণের আদি কারণ কি না বুঝিবার জন্য সাধককে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সাধনায় প্রেম বিরহ অনুরাগ আবেগ, এক একটা মনুষ্যজীবনকে জন্ম জন্ম কতবার ঘুরাইয়া লইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ?

পরন্তু এইখানেই যে মানুষের সর্ব্ব সাধনার পরিসমাপ্তি এরূপও নহে। ইহারও উর্দ্ধে বুদ্ধি বিরাজমান—তাহার অনন্ত লীলাভঙ্গী উপলব্ধি করিয়া সমস্ত মনুষ্যজীবনটার একটা সার মর্ম্ম বুঝিতে হয়। এই সার আনন্দস্বরূপের জ্ঞানেই সর্ব্বানন্দ লাভ হয়। এক একটি সাধনা পর পর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে যখন মানুষের অন্তর বাহির প্রকাশ হইয়া পড়ে, পরাজ্ঞান লাভ হয়, তখনই সে মুক্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে—আজও যদি আমাদের হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পূর্ণযোগসাধনার পথে আসিতে হয়, তবে চক্রপথে ঘূর্ণায়মান বলদের মত ক্রমাগত আমরা একই পথ পরিক্রমণ করিব। আমাদের অদ্ভুত অতীতপরায়ণতার সংস্কার আমাদের আত্মজ্ঞানের সাধনাটাকে এমন এক কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিয়াছে যে, সাধনা বলিতেই আমরা সেই অরণ্যবাসী চীরকৌপীনধারী সন্ন্যাসীর কথা মনে করি ; সেই বৌদ্ধযুগকে, সেই শঙ্করযুগকে পুনরানয়নের প্রবৃত্তি আমাদের জাগিয়া উঠে।

আমরা যে নূতন সাধনার কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—ইহা অধ্যাত্মযোগ বা আত্মসমর্পণযোগ। এই আত্মসমর্পণ যোগ হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এমন কি ত্রিমার্গযোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহাই মানুষকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

১

যোগ সাধনার দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা ধারণা করিয়াছি, তাহা ভাষার সাহায্যে লিখিয়া দিতে পারা যায় এবং পাঠকও তাহা পাঠ করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সাধনা না থাকিলে যোগের তত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। খুব ধৈর্য্য সহকারে, একাগ্রচিত্তে যোগরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য একটা অটল সঙ্কল্প করা চাই ; এই সঙ্কল্প যত দৃঢ়, যত স্থায়ী হইবে, যোগের পথও ততই সুগম বোধ হইবে। ভোগবিলাসের জন্য আমরা সময়ে সময়ে যেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ি, এই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা চাই। সঙ্কল্পসাধনই যোগের প্রথম উপাদান। সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তিরই সাধনা স্বল্পায়াসে সুসিদ্ধ হয়। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই, সে অসার অপদার্থ। একটি দিনের অটল সঙ্কল্প, দেবব্রত ভীষ্মের জীবনে অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি ভারত-ইতিহাসে অমর-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়াই বলশালী বৃকোদর দুঃশাসনের রক্তপানে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঞ্চালী সঙ্কল্পসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কেশপাশ মুক্তই রাখিয়াছিলেন, সঙ্কল্প বলেই বীর জয়দ্রথকে মুণ্ডিত-মস্তক করাইয়াছিলেন, অশ্বত্থামার মাথার মণি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই সে ভোগের অধিকারীই হইতে পারে না, তা যোগ সাধনা করিবে কি প্রকারে ? সংসারের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে যাহার প্রাণে একটি সঙ্কল্পেরও উদয় না হইয়াছে তাহার জীবনই বৃথা। আমি শুদ্ধ হইব, সত্যবাদী হইব, প্রাণ দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিব, এইরূপ যে কোনও একটি সঙ্কল্প যোগসাধনার ভিত্তিভূমি।

আমাদের এই অধ্যাত্মযোগগ্রহণপ্রয়াসী সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তি আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করিবেন। কেমন করিয়া, কোথায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, যোগের ধারা কি প্রকার, এই সমস্ত বিষয় এইবার বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

যোগ বলিতে সাধারণতঃ আসন, প্রাণায়াম, কুম্ভক, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপেরই আশ্রয় লইতে হয়, কেননা দেহ এবং প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক চিত্ত, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি চক্র ভেদ করিয়া সহস্রদলে উপনীত হন। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত সাধন প্রণালী হঠযোগীদের। বৈদান্তিকগণ বুদ্ধি হইতে সাধন আরম্ভ করেন। আমরা তান্ত্রিক—তন্ত্রের পথই মহৎ পথ। আর শক্তি হইতে সাধন আরম্ভ করাই প্রকৃত সত্য ও একমাত্র তন্ত্রমার্গ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ পথই জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—তাই তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমে শক্তি উপাসনা কর, শক্তিকে পাইলেই সৎকে পাইবে।" এই শক্তি উপাসনা করিতে গিয়াই, প্রচলিত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর সঙ্কল্প-পরায়ণ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানবিশিষ্ট চরিত্রবান্ ব্যক্তিই যোগসাধনার অধিকারী। এই অধিকারী না হইলে ভুল পথ অবলম্বন স্বাভাবিক। কপালে সিন্দুরের টিপ, রক্তবস্ত্রপরিহিত, যে সকল নরনারীকে প্রায়ই সমাজের ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই উক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়। ইহারা ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি সাধনা করে। হিন্দু সমাজের কত অবলা বিধবা ইহাদের কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মের নামে যে দুর্নীতির অনুসরণ করে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমি কিন্তু যে শক্তি উপাসনার কথা বলিতেছি, তাহা উক্ত আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক সাধনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের। মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পুরুষ এবং শক্তি বিদ্যমান। ঐ পুরুষই

পরমেশ্বর। ঠাকুর স্বামীজীকে এই কেন্দ্রসত্য ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখ মনে রাখিও তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই ঈশ্বর—তুমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পার, আবার নরকের কৃমিকীট হইতে পার।"

তোমার ভিতরে স্ত্রীরূপিণী শক্তি অধিষ্ঠিতা। পুরুষের ইচ্ছা হইলে, ঐ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য ভিতরে একটা শক্তি জাগিয়া উঠে এবং উহা সম্পন্ন করাই শক্তির উদ্দেশ্য।

এই ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নানা কার্য্য করিতেছ। যে শক্তির সাহায্যে তুমি কার্য্যাদি সম্পন্ন কর উহা অসীম, কিন্তু মোহগ্রস্ত বলিয়া সাধারণ জীবনে যে যোগরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইতেছে।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলি। যোগ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আমার ভিতরেই ভগবান আছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাই, বাসনা হউক, চেষ্টা হউক যে-কোন প্রকারে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে; এবং শক্তি, পুরুষের ইচ্ছা বা বাসনানুযায়ী দেহযন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছেন। মানুষ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ যোগ অভ্যাসই করিতেছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবনের প্রতি ঘটনার অন্তরালে এই শিব শক্তির খেলা দেখিয়া কৃতার্থ।

ইচ্ছা যখন বাসনার আকারে দেখা দেয়, তখন বুঝিতে হইবে জীব মোহগ্রস্ত; ভীষণ অশুদ্ধতাই ইহার কারণ। এই মোহ, এই অশুদ্ধতা, সাধন সাহায্যে বিনাশ করিয়া শুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে, বরং ইহার বিপরীত। ভগবানের বাসনা বা চেষ্টা ছিল না—তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগতের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য এই বিকাশ কার্য্যকারণ সম্বলিত, স্থান এবং কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

জগতের প্রতি ঘটনা, প্রতি বিকাশ, কল্পারম্ভে তোমার মধ্যে সুপ্ত ছিল—ভগবানের ইচ্ছায় কেবল স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে মাত্র। অতএব যাহা তুমি স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়াছ, তোমার বাসনা বা চেষ্টাদ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পার না; কেবল সাক্ষীরূপে সেই সকল পূর্ব্বকল্পিত বস্তুর শক্তি কর্তৃক বিকাশ দৃষ্টিগোচর করিতে পার। মনে রাখিতে হইবে তুমি তোমারই ভগবান, ব্যক্তিগত ঈশ্বর; আর পরমেশ্বর নিখিল ভুবনের অধীশ্বর। স্থান, কাল ও অবস্থার চিন্তা তোমার পক্ষে অনাবশ্যক—সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার ভিতর দিয়া যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিলেই সমতা আসিবে, প্রতি ঘটনার ভিতর দিয়া আত্মচৈতন্য ফুটিয়া উঠিবে, বাসনা বা চেষ্টা অন্তর্দ্ধান করিবে। এই বাসনা বা চেষ্টার তিরোধান হইলেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। এই জ্ঞানোদয় একবার যদি হয়, তাহা হইলে আর বাসনা বা চেষ্টার ভয় থাকে না। এক্ষণে এই মহতী ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হও, এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া তোল। জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, জ্ঞানই প্রাণসংযম করিয়া মনের চঞ্চলতা দূর করে। ভগবদ্ ইচ্ছার প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকিলে, তোমার বাসনা বা চেষ্টা কিছুতেই থাকিতে পারে না। মনে রাখিও তুমিই ঈশ্বর, তোমাতেই শক্তি অধিষ্ঠিতা। তুমি অনুমন্তারূপে আদেশ কর, সাক্ষীস্বরূপ প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর, ভর্ত্তা হইয়া আধারযন্ত্রকে বজায় রাখিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য কর—তামসিক উদাসীনতা অথবা রাজসিক উত্তেজনায় ইহাকে ধ্বংস করিও না। তোমার ভিতর ইচ্ছারূপিণী যিনি আছেন, অজ্ঞানতাবশতঃ, যাহার স্বরূপ আপাততঃ বোধে আসিতেছে না, তিনি নিষ্কর্ম্মী নহেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেই যে জড়ত্ব আসিবে, এরূপ কল্পনা যাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সমুদিত হয়, তাহারা অহংরূপী ব্রহ্মের

উপর নিশ্চয় আস্থাবান নহেন। তুমিই জ্ঞাতা। প্রকৃতি যাহা কিছু জ্ঞেয় আহরণ করিতেছেন—তাহা গ্রহণ কর। যেরূপ বলিতেছি ঠিক এই ভাবেই জীবনের প্রতি কার্য্য সম্পাদন কর, দেখিবে তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না—সমস্তই শক্তিরূপিণী কালী করেন। ব্যস্ত হইও না, চিন্তা করিও না কিম্বা ধৈর্য্য হারাইও না—অনন্ত জীবন তোমার সম্মুখে—এত ব্যস্ততা কিসের ? কেবল লক্ষ্য রাখিবে, তামসিকতায়, অলসতায় যেন জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট না হয়।

২

আমি যে দেহাতিরিক্ত আর একটা কিছু, ইহা নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে বুদ্ধিদ্বারা অধিগম্য হইলেও, সাধন সাহায্যে যেরূপ পরিস্ফুট হয়, এরূপ আর কিছুতেই সম্ভব নহে।

আমরা গীতার "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি ছন্দঃ যত জোর করিয়াই আবৃত্তি করি না কেন, বাহ্যশরীরেরই সহিত যে আমরা অধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একথা জীবনের প্রতি ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়া শরীরের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ যে ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ কথা বলি না। তবে বাহ্যাবয়বটা যে আমাদের অবিনশ্বর 'আমি'র পরিচ্ছদ, একথাটা সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে আত্মার ইচ্ছানুযায়ী অবলীলাক্রমে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে কোন দ্বন্দ্বই আসিবে না—আমাদের এইরূপ একটা অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

ইহাই আনন্দের অবস্থা। যোগসাধনায় যে সকল প্রলোভন আছে, একস্থানে দেহ রাখিয়া যথাতথা ভ্রমণ, একটি যষ্টি অবলম্বন করিয়া তদুপরি যোগাসনে উপবেশন, সমাগত ব্যক্তিবর্গকে অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শন, প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য এই যোগ প্রশস্ত নহে। অথবা ষট্‌চক্রভেদ করিয়া

ব্রহ্মে লীন হইয়া যুগযুগান্তর কাল পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান করিবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্যও এই যোগ কার্য্যকরী নহে। এই যোগে ভগবানের ইচ্ছার সহিত সাধকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর তিনি সমস্তই নির্ভর করেন। কি হইতে হইবে, কি হইতে হইবে না, এরূপ কোন কল্পনাই যোগীর অন্তরে স্থান পায় না। ভগবান্ যোগীকে যন্ত্রস্বরূপ পরিচালন করেন। যে আনন্দে আনন্দময় ক্রীড়া করেন, সেই আনন্দই জীবের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে ভুলিয়া যায় সিদ্ধি অসিদ্ধি, জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ—থাকে কেবল একটি অবিচ্ছেদ আনন্দ—সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গস্বরূপ জীব নৃত্য করিতে থাকে।

এক্ষণে এই অধ্যাত্মযোগ বুঝিতে হইলে, বাহ্যশরীর ব্যতীত সূক্ষ্মশরীরের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। কারণ, এই যোগের লক্ষ্য সমস্ত আধারের রূপান্তর—আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে পুরাতন প্রাকৃত সত্তা ও সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া অভিনব দিব্য ধর্ম্মে গড়িয়া তোলা।

মানুষ বলিতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গণ সমন্বিত একটা রক্তমাংসের মূর্ত্তিমাত্র। এই মূর্ত্তি পরিচালিত হইতেছে ভিতরের প্রেরণায়, ইহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন; এই ভিতরের যন্ত্রটী মানুষের সূক্ষ্ম-শরীর। সেটী প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। এই স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম দেহ আছে, উহা সমস্ত জড়দেহটাকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা সূক্ষ্ম হইলেও জড়দেহের সহিত ইহার সংযোগসূত্র আছে। মানব-আধারের শীর্ষদেশে ইচ্ছারূপিণী মহাশক্তি বিরাজ করেন, ইনিই এই দেহরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যোগীজন যে সহস্র-দলের কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই ইঁহার সিংহাসন, ইনিই দেবতার আদেশে, ত্রিলোকে লীলা প্রকটন করিয়া তাহার আনন্দ বিধান করেন। এই প্রকৃতিশক্তি এবং সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রকৃতি যন্ত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম-

দেহকে স্পন্দিত করেন, সূক্ষ্মশরীরে তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের মস্তিষ্ক তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমে জ্ঞান (knowledge), দ্বিতীয় বিচার বুদ্ধি (reason), এবং তন্নিম্নে বোধশক্তি (understanding) বিরাজ করিতেছে। তারপর হৃদ্‌পিণ্ডের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মন প্রতিষ্ঠিত—ইহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রশক্তি। তন্নিম্নে হৃদয় হইতে নাভিতলের মধ্যে চিত্ত, নাভিতল হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম প্রাণ বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে মোটামুটি মানবদেহকে এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া হউক। ইচ্ছাশক্তি (Will of God), জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি, মন, চিত্ত ও প্রাণ—এই গুলি লইয়া সূক্ষ্মদেহ, আর স্থূলদেহ এই স্নায়ুময় এবং অন্নময় মানবশরীর অর্থাৎ রক্তমাংসময় দেহ।

মানুষ, তাহার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করে। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করিবার পথপ্রদর্শক। এক্ষণে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্য কিরূপভাবে সূক্ষ্মশরীরে উপনীত হয়, তাহা দেখা যাউক। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি কিন্তু যন্ত্রটী দেখে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন দেখে; সে কে? মন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন ইন্দ্রিয়গুলির বল্গা ধারণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কিছু উপরে বসিয়া আছেন। যখন বাহিরের সৌন্দর্য্য চক্ষের ভিতর দিয়া মনে পৌছিল, তখন মনে স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিল। এই স্পন্দনই চিত্তকে সজাগ করিয়া তুলিল—চিত্ত অমনি দৃষ্ট পদার্থটিকে আঁকিয়া বসিল। বুদ্ধির ধর্ম্ম বুঝা (to understand); চিত্তের রেখাপাত বুদ্ধি বুঝিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণকে উত্তেজিত করিল—দর্শন সুখ ভোগ করিবার জন্য। অনন্তর প্রাণ ভোগ করিল। মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা, প্রাণও তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীকে ইচ্ছা করিলেই চালাইয়া লয়, কার্য্য করাইয়া লয়। সূক্ষ্ম প্রাণের ভোগের অভিব্যক্তিই স্থূল শরীরে প্রকাশিত হয়।

বিষয়টী বড় জটিল। সেইজন্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। শ্যামের বাঁশী বাজিল, ফুকারিয়া ফুকারিয়া বৃন্দাবনে কানন প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রীরাধার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল তার প্রাণ"। কেন? ভোগের জন্য নহে কি? শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্যামরায়ের তত্ত্বকথা শ্রীরাধার মরমে পশিল। মরম কিনা মানস-সত্তা স্পন্দিত হইল (sensation), চিত্ত রসসৃষ্টি করিয়া (emotion) বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামরায়ের অতুলনীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিল। বুদ্ধি বুঝিল এক্ষণে কিসের প্রয়োজন, সে প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল—প্রাণ স্থূল দেহযন্ত্রকে উন্মাদ করিল। শ্রীরাধা লজ্জা ঘৃণা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই বাঁশীর রব ভোগ করিবার জন্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবতার সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য ছুটিল। কেমন করিয়া মানুষ সংসাররঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছে এক্ষণে তাহার কতকটা পাঠকবর্গের ধারণা হইবে।

অতঃপর সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের যন্ত্রগুলির স্বভাব নিরূপণ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন যাহা দেখে যাহা শুনে, তাহা বুঝিয়া শরীরযন্ত্রকে পরিচালিত করে; পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয় সংযোগ হই-লেই মনে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। চিত্ত, মনের স্পন্দনে দৃষ্ট পদার্থের উপর প্রেম, ঘৃণা, ভয়, লোভ উৎপাদন করে; প্রাণ, ভোগের জন্য শরীরযন্ত্রকে কার্য্য করায়। ইহাই স্বাভাবিক জীবের কার্য্য। এক্ষণে মন যদি স্বাধীনভাবে শুধু দেখিত, শুনিত; চিত্ত যদি কেবল মনের ছবি আঁকিয়া ও তদুপরি রসারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; বুদ্ধি বুঝিয়া জানিয়া নীরব হইত; প্রাণ নির্ব্বিকারচিত্তে ভোগ করিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিত—তাহা হইলে কোনই কথা থাকিত না। কিন্তু এরূপ হয় না। কাহারও কাহারও ভিতর প্রাণশক্তি এত প্রবল যে, সে চিত্ত মন ও বুদ্ধির উপর প্রভুত্ব করিতে

ব্যগ্র হয়—ফলে কোথাও কোথাও চিত্ত, মন ও বুদ্ধি প্রাণের নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হয়। প্রাণের সংস্কারগত বাসনা চরিতার্থ করাই চিত্ত, মন ও বুদ্ধির একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠে—প্রাণের প্রভাবে উহারা আপনাদের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ফেলে। আবার কখনও মন ও বুদ্ধির উপর চিত্ত কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে—বুদ্ধি সেখানে চক্ষুহীন। চিত্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অন্ধভাবে কার্য্য করিতে থাকে। চিত্তের—প্রেম, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধের বশে বুদ্ধির বিচারশক্তি থাকে না; সে ঐ প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতির যন্ত্রপুত্তলী হয়, অকারণ হিংসা বা ক্রোধের উদয় হইলেও বুদ্ধি তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়, কেননা সে চিত্তের বশীভূত। আবার মন যদি বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন মন যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করে—দেখা শুনা দ্রব্যের বিষয় বিচার করিবার তাহার আর অধিকার থাকে না। এইরূপ বিচারবুদ্ধিও যদি জ্ঞানের কার্য্যে অন্তরায় হয়, তাহা হইলে মানুষ যুক্তি, তর্ক, কল্পনার অতীত কারণের সত্যে উপনীত হইতে পারে না। এমনকি ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতিও এই জ্ঞানের প্রখরতায় আপনাকে সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অনুদার বোধ করেন। সুতরাং কোনও মহৎ কার্য্যে মানুষ সফলতার আশা করিতে পারে না। তাহার ভিতরে যে বিপ্লব চলিয়াছে তাহার ফলে জীবন দারুণ অবসাদগ্রস্ত হয়।

এক্ষণে যোগের কি আবশ্যক? জীবশরীরের প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রকৃতিশক্তিকে অনুমন্তারূপে আদেশ করিতেছেন—উঠ, জাগ এবং এই ত্রিলোকে যে ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রশমিত করিয়া সমতা সম্পাদন কর, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। প্রকৃতি, পুরুষের আদেশমাত্র জাগ্রত হইয়া ত্রিলোকের উপর আপনার অনন্ত শক্তি সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এই সমগ্র দেহযন্ত্র ধর্ম্মসঙ্করদোষে দূষিত। ভগবানের আদেশে ইহা আজ শক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে—প্রকৃতি আমাদের যন্ত্রগুলির

ঔদ্ধত্য দূর করিয়া বশীভূত করিবেন। অতঃপর ইনি বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য নিয়োগ করিবেন, ইহার আদেশ করিবার অধিকার থাকিবে না। মন কেবল দেখিবে, শুনিবে, স্পর্শাদি অনুভব করিবে, আদেশ অথবা বিচার করিবে না। চিত্ত রসানুভবের সৃষ্টি করিবে, পরন্তু কোন আদেশাধিকার তাহার থাকিবে না। প্রাণ কেবল ভোগ করিবে, অন্য কোনও যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রয়াস পাইবে না। প্রকৃতি এই সমস্ত সূক্ষ্মযন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া বাহ্যশরীরকে চালনা করিবেন, কার্য্য করাইবেন—শরীরের স্বতন্ত্র অহংকার থাকিবে না—ইচ্ছা, জ্ঞান, অনুভূতি, রসবোধ, ভোগ কোনও কিছুকেই সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার থাকিবে না। এই গুলিই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী স্ব স্ব কার্য্য করিবে মাত্র। প্রকৃতি, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি—স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ভগবানের যন্ত্র। ভগবানের আদেশে প্রকৃতি যন্ত্র পরিচালন করিবেন। আজ পুরুষ প্রকৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে, তাঁহার এই বিরাট সৃষ্টিযন্ত্রকে সমর্পণ করিবেন—সৃষ্টি ছাড়া আমরা নহি—অতএব আমাদেরও দেহযন্ত্র প্রকৃতির অনুগত হইবে। পুরুষের ইচ্ছায় দেহযন্ত্রের সকল কর্ত্তৃত্ব ঘুচিয়া তাহাদের সনাতন সত্য স্বভাব পুনরাবর্ত্তন করিবে। এইজন্যই আত্মসমর্পণ যোগ। আত্মসমর্পণ করিলে ভগবানই সাধক হইয়া এই সাধনলীলা প্রকটন করেন।

৩

যোগশাস্ত্রে সূক্ষ্মদেহের যে সকল নাম আছে তাহা হইতেছে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। এই প্রাচীন শব্দগুলি সাধারণ ও সহজ করিয়া দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছা বলিব; মূলা-

ধারে অন্নময় কোষের মূল অর্থাৎ স্নায়ুময় দেহযন্ত্র, সাধিষ্ঠান হইতেছে সূক্ষ্ম-প্রাণ, মণিপুর রসস্থান চিত্ত, অনাহত মন, বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং আজ্ঞাচক্রই ইচ্ছাশক্তি। এই সকল যন্ত্র ও ইহাদের কার্য্যকলাপের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি সহস্রদলের মূল দিব্যশক্তির অনুগত হইয়া কার্য্য করিলেই যোগের সিদ্ধি।

কিন্তু প্রাণ যখন চিত্তের, চিত্ত যখন মনের, মন যখন বুদ্ধির কার্য্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখন বুঝিতে হইবে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসঙ্করদোষ নাশ না করিলে জীবের স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবন লাভ একান্ত দুরূহ।

অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন আমিই যখন ঈশ্বর, আমার ইচ্ছাতেই যখন সর্ব্ব কর্ম্ম সংসাধিত হয়, তখন এরূপ হয় কেন? ইহাই ত অজ্ঞানতা। পুরুষ স্বসৃজিত মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়া আপনার ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; তিনি ক্ষুদ্র দেহরাজ্যকেই আপনার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সহিত আপনাকে আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছেন।

শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি যন্ত্রগুলি কি ভোগ করে, না, ইহাদের ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে? ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগী কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত। এই বিস্মৃতি হইতে মুক্তির ইচ্ছা করিলেই জীবশরীরে যোগীর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইচ্ছা (Will)—বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য, মনকে বাহ্যজগতের বিষয় গ্রহণের জন্য, চিত্তকে রসসৃষ্টির জন্য, প্রাণকে ভোগের জন্য এবং দেহকে কার্য্য করিবার জন্য, পুরুষের শাসনে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।

ইচ্ছা পুরুষের। কোনও যন্ত্রের আজ্ঞাধীন ইনি নহেন। পুরুষের

সহকারিণী এই শক্তি শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু। ইনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে অপর শরীর-যন্ত্রগুলি লইয়া ক্রীড়া করেন; বাসনা, ব্যগ্রতা, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কোন ভাবেই ইনি আবদ্ধ নহেন। পুরুষ যাহা চাহেন, ইনি নিরাসক্তভাবে তাহাই সম্পাদন করেন।

এই শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা চাই। শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করার পর সংশয়ের জালে জড়াইয়া আবার যেন চেষ্টা ও বাসনাকে পুনঃ জাগরিত না করি, এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মৃত্যুপণ না করিলে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। শক্তির উপর অটল বিশ্বাস ঘটিলেই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন শক্তির খেলা চলিতে থাকিবে। যতদিন না এই শক্তিকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, ততদিন শরীর, প্রাণ, মন যতই চঞ্চল হউক উহাঁর দিকে লক্ষ্য করিব না। শক্তিলাভ হইলে অর্থাৎ শক্তি অনুভূত হইলে শক্তিই সকল অন্তরায় দূর করিয়া দিবে। সাধককে প্রথমে এই শক্তি উপাসনাই করিতে হইবে।

সাধক শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে পর, শক্তি আধারের শুদ্ধিবিধানে যত্নশীলা হন। এই অবস্থায় আধার পুরাতন স্বভাব, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সহজে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়। ইহাই দ্বন্দ্বের (struggle) অবস্থা। এই অবস্থা ধৈর্য্যসহকারে কাটাইতে পারিলে, যোগের পথ অধিকতর সুগম হইয়া উঠে।

মানব-জীবন স্বভাবতঃই অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ। এই অসিদ্ধ অবস্থাই মায়াবশে জীবের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হয়। শক্তির কার্য্যের বিরুদ্ধে আধারের প্রত্যেক যন্ত্রই তাহাদের চিরদিনের স্বভাব ও সংস্কারকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাহারা বলে—আমরা মঙ্গল চাহি না, আনন্দ চাহি না, পূর্ণতা চাহি না, আমরা বেশ আছি। শক্তি কিন্তু শ্রীভগবানের পূর্ণবিকাশের জন্য অদম্য বেগে শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতির

সঙ্কীর্ণতা, অপূর্ণতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

মানুষের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া তোলাই প্রকৃতির সনাতন পদ্ধতি। তিনি মানুষকে ক্রমশঃ এই পথেই অগ্রসর করাইতেছেন; কিন্তু সে গতির বেগ এত অল্প, যে শত বৎসর পরেও জীব, জীবনের ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যোগ এই গতিকে অত্যন্ত ক্ষিপ্র করিয়া তুলে, মুক্তির দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়—এইজন্য যোগ-জীবনই প্রশস্ত।

পূর্ব্বস্বভাবই যোগের পথে প্রধান অন্তরায় এবং ভগবানের ইচ্ছাই মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই ইচ্ছাকে সর্ব্বাগ্রে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই। বাসনাপরবশ আমরা স্বভাবতঃ যাহা করি, তাহার ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যোগ আরম্ভকালে, আমরা কোন্‌টি বাসনা, কোন্‌টি প্রেরণা ইহা স্থির করিতে অসমর্থ। এই অবস্থায় উপায় কি? উপায়, যাহাই করি না কেন মনে রাখিব "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ভাল মন্দ, শুভ অশুভ যে-কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা সাধিত হউক, তাহার দায়িত্বভার আমরা কিছুতেই বহন করিব না; এবং প্রিয় অপ্রিয় ফলভোগের প্রতিও সমানরূপে উদাসীন হইব, কেননা ভোক্তা ভগবান্। এইরূপ যুক্তি দ্বারা প্রথমেই আমাদের প্রাণকে বাসনাশূন্য করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত আত্মসমর্পণ মন্ত্রেরই একাগ্র সাধনবলে চিত্ত ও বুদ্ধির সমতাবিধান করিতে হইবে। চিত্তের ক্ষিপ্ততা, মূঢ়তাকে পরিবর্জ্জন করিব এবং বুদ্ধির কল্পনাজগতে বিচরণ বন্ধ করিয়া দিব। আমাদের মধ্যে—দেহ, প্রাণ, মন ছাড়া আর একটি যন্ত্র আছে যাহার শক্তি অপরিসীম; তাহা হইতেছে বিজ্ঞানময়-কোষ। এই বিজ্ঞানময়-কোষ দিয়া আমরা উপরোক্ত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করি; কিন্তু শুধু হৃদয়ঙ্গম করিলেই চলিবে না, যাহা বুঝি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহা আরম্ভ

করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্র, অসমর্থ, অনুদার—ইহা কি বাস্তবিকই সত্য? বিজ্ঞানময়-কোষ (দিব্যজ্ঞান) বলিতেছে—না, ইহাই তোমার মায়া, ইহাই তোমার অহংকার। এই মায়া, এই অহংকার ত্যাগ করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তুমি পূর্ণ, অনন্ত, উদার, বৃহৎ।

দেহের অহং, প্রাণের অহং, মনের অহং পরিহার করিলেই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি এইগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলে। তখন ভগবান্‌কে এই শরীরের দ্বারা ধারণ করা যায়, প্রাণের দ্বারা ভোগ করা যায়, মনের দ্বারা ভালবাসা যায়, বুঝিতে পারা যায় তাই মানুষের মধ্যে ধারণাসামর্থ্য, ভোগ-সামর্থ্য এবং প্রেমসামর্থ্য ও জ্ঞানসামর্থ্য জাগিয়া উঠে। অন্তরায়গুলিকেও জানিয়া রাখা আবশ্যক। অশুদ্ধ প্রাণ, মন, বুদ্ধিদ্বারা আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি, সেই সমস্ত অর্জ্জিত অভ্যাসের একটা প্রভাব আছে। অহংকার স্পর্শে সেগুলি মলিন এবং অপূর্ণ বটে, কিন্তু নূতনের জন্য তাহারা সহসা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হয় না।

প্রথমেই তাহারা ইচ্ছাশক্তির সহিত প্রবল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়, ক্ষেত্রস্থিত পুরাতন সংস্কার, প্রাণ মন বুদ্ধির ভিতরে ভগবৎ-শক্তিকে কার্য্য করিতে দেয় না। এই ইচ্ছাই কালীশক্তি, ইনি ভগবৎ-প্রেরণায় পুরাতনকে পরাস্ত করিয়া ধীরে ধীরে সাধকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন বুদ্ধি জাগ্রত করেন; ক্রমে সাধকের অন্তঃকরণ হইতে পুরাতন প্রস্থান করে।

প্রস্থান করিলেও, দূরে থাকিয়া অশুদ্ধ শক্তিগুলির সমবায়ে এই পুরাতন, নূতনের উপর সাধকের বিশ্বাস ও জ্ঞানকে দূর করিয়া দিবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু কালীশক্তি একবার অন্তঃকরণে স্থান পাইলে ক্রমেই প্রবল হইয়া পুরাতন স্বভাবের এই দ্বিতীয় স্তরের আক্রমণ অনায়াসেই পর্য্যুদস্ত করিয়া জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অচল করিয়া লয়েন।

স্বভাবের তৃতীয় চেষ্টা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের। কালীশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

জীবদেহে এই দেবশক্তির প্রতিষ্ঠা একদিনে সম্ভবপর নহে। জীবনের শুদ্ধিবিধানকল্পে মাতৃশক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্প যোগের প্রথম মন্ত্র। কালীশক্তির প্রবেশ কালে জীবের পুরাতন প্রকৃতির সহিত এই যে দ্বন্দ্ব উহা অতি ভীষণ। এই অবস্থাতেই ভুলভ্রান্তি, অবিশ্বাস, বাসনা কামনা, লোভ মোহ, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, বিচার আচার প্রভৃতির কুহকে জীবকে যোগভ্রষ্ট করিয়া দেয় কিন্তু এই প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যদি সাধকের মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছা একবার স্থান পায়, তাহা হইলে আর যোগভ্রষ্ট হইবার শঙ্কা থাকে না।

জীবের স্বভাব, পদে পদে অন্তরায়স্বরূপ হইয়া যেমন যোগীকে হতাশ ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, যোগের ক্রমোন্নতি তেমনি সাধককে উৎসাহ দেয় এবং আশান্বিত করে। কাল যেমন নির্দ্দিষ্ট গতির মধ্যে প্রবাহিত হয়, যোগও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ক্রমোন্নতি লাভ করে।

সাধক যোগাবলম্বনের পরেই জীবনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের আভাস পায়। পূর্ব্বে বিমূঢ় অবস্থায় প্রিয়-অপ্রিয় যে-কোন কার্য্য করিত তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তির অভাব হেতু রাগদ্বেষ কামক্রোধ উদয় হইয়া জীবকে ক্লেশ দিত, কিন্তু যোগ গ্রহণের পর যে দ্বন্দ্ব, তাহার আকার অন্যরূপ।

ইচ্ছাশক্তি জীবকে যে-ভাবে পরিচালিত করিতে চায়, ভূতাবিষ্টের মত উহা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, এইরূপ একটা ধারাবাহিক জ্ঞান ভিতরে জাগিয়া উঠে। তবুও ইহারই মধ্যে কখন সমর্থ কখন অসমর্থ, কখন উত্থান কখন পতন, কখন ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম কখন বাসনার দাস— এমনই একটা বিপ্লবের মধ্যে, এমনই একটা আবর্ত্তনের মধ্যে, একটা দোটানার বাঁধনে যে আবদ্ধ হইয়াছি এইরূপ মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

এই দ্বন্দ্বভোগ করিতে অসমর্থ হইলে যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সাধক দ্রষ্টাস্বরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত এই অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে দেখিবে ক্রমেই পুরাতন ভালমন্দ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে, আধার যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠিতেছে—প্রাণ, মন, বুদ্ধির প্রভাব ছাড়া একটা অজ্ঞাত শক্তি জীবন অধিকার করিতেছে। যোগের এই গতি প্রাথমিক। দ্বন্দ্বের অবস্থায় ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধকের আশা ও উৎসাহ হয়।

কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইলে পথের সকল সামগ্রী যেমন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে হয়, সেইরূপ সাধনার সময় জীবনের কুসংস্কারগুলি একে একে সাধকের লক্ষ্যে আসে ও ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া থাকে। কিন্তু কালীশক্তির প্রতিষ্ঠা জীবের মধ্যে যতই দৃঢ় হয়, এই গতির বেগও ততই দ্রুততর হইতে থাকে, তখন কোথা দিয়া কি হইয়া যায় তাহা দেখিবার আর অবসর থাকে না—যেমন মটরে চড়িয়া পথ অতিবাহন করা। যোগের আরও এক প্রকার গতি আছে, তাহাতে কালীশক্তি এক মুহূর্ত্তে সকল অশুদ্ধতাকে সংহৃত করিয়া লন, সাধক তখন নিমেষেই প্রত্যক্ষ করে তাহার আধার শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলের জীবনে ইহা ঘটিয়া উঠে না, অবতার বা বিভূতিদিগের জীবনেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধককে প্রথমে এই কালীশক্তির উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই মাতৃশক্তিই যে শুদ্ধ করিয়া দিবেন, এতদ্ব্যতীত অন্য প্রয়াস বা চেষ্টা করিতে হইবে না সে বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে। পরে এই শক্তি কেমন করিয়া জীবনকে শুদ্ধ ও দেবতার আবাসস্থল করিতেছেন ধীরচিত্তে তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমি ভর্ত্তাস্বরূপ এই দেহযন্ত্রকে ধারণ করিয়া রাখিব, কালীশক্তি ইহার সর্ব্বদোষ দূর করিয়া ইহাকে অমৃতময় করিয়া তুলিবেন।

৪

শক্তির উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীবের সকল ব্যক্তিগত চেষ্টা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তখন যে-কোন ঘটনাই জীবনের উপর দিয়া হইয়া যাউক না কেন তাহাতে দেহ প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বুদ্ধি যেন কালীশক্তির উপর শ্রদ্ধাহীন না হয়। অন্যান্য আধার শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব থাকিবেই, এবং সংস্কারবশে ভালমন্দ যাহা ধারণা করিয়াছি, বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারই ব্যঞ্জনায় আধারযন্ত্রগুলি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ যোগ বুদ্ধির দ্বারা প্রথম আরম্ভ করা হইয়াছে—সুতরাং বুদ্ধি যেন কোন অবস্থায়, কোন ঘটনায়, কোন বিপদে কালী-শক্তির উপর বিশ্বাস না হারায়—সর্ব্বাবস্থা যে আমার সমগ্র আধারের শুদ্ধি-বিধানের জন্য আগত এ কথা অবিরত মনে রাখা চাই। ঘটনার পর ঘটনাই জীবনের সাধনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সমস্ত জীবনটাই যোগ।

সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, ঘৃণায় প্রশংসায় বুদ্ধি যখন স্থির হইবে, যখন বুঝিবে যে এ-সকলই মায়ের ইচ্ছা, তখনই হইবে শক্তি উপাসনার অধিকারী। মনে রাখিতে হইবে এইটুকু হইলেই সব হইল না—সিদ্ধি তখনও বহুদূর। তুমি সাধক হইলে মাত্র—মা তোমার আধারে আগমন করিলেন; অতঃপর তোমার বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন চিত্ত প্রাণ দেহ প্রভৃতির সকল আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে। এই অবস্থায় সাধককে বড়ই বিব্রত হইতে হয়। যেমন বহুশত বৎসরের ধূলিরাশিপূর্ণ কক্ষে সহসা সম্মার্জ্জনী পড়িলে চতুর্দ্দিক ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, গৃহমার্জ্জনকারীর সে ধূলায় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ আধারস্থিত কুসংস্কার ও পূতিগন্ধযুক্ত দুষ্কৃতিরাশি যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া

সাধককে মহাবিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে; তখন কালীশক্তির উপর অকপট শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেই সকল কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধককে অদ্ভুত শক্তি প্রদান করে। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, যোগ জীবনের ভোগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেবজন্ম প্রদান করে। এই ভোগ দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধির জন্মার্জ্জিত সংস্কার; সাধারণ জীব এই সংস্কার স্বভাববশে ধীরে ধীরে বহুজন্ম ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া যায়, যোগী যে সে সহস্র বৎসরের ভোগ এক বৎসরে অথবা এক-দিনে শেষ করিতে পারে। যাহার জীবনে এই সংস্কার ভোগ অধিক দ্রুত হইবে, তাহাকে অধিক বেগ, অধিক আঘাত সহ্য করিতে হইবে এবং অনতিকালের মধ্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু কাহার জীবনের ভোগ অধিকতর সংক্ষিপ্ত হইবে তাহা সাধকের দেখিবার আবশ্যক নাই। কালী তাহা আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন অতএব তিনি তাহার বিধান করিবেন।

এইবার কেমন করিয়া প্রত্যেক যন্ত্রটি শুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় একে একে তাহাই বলিব। প্রথমে বুদ্ধির কথা বুদ্ধি তাহার সমগ্র শক্তি দিয়া কালীকে অবলম্বন করিবে; জীবনের উন্নতি অবনতি, ভালমন্দ, সকল ভার কালীর হস্তেই সমর্পণ করিবে, যেমন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বস্ব এই কালীশক্তিকে অর্পণ করিলাম—কালীই সর্ব্বপাপ হইতে আমায় মুক্ত করিবেন—আমার জন্য আমার আর ভাবনা নাই—এইরূপ ধারণা দৃঢ় করিতে হইবে।

এইরূপ করিলেই বুদ্ধি যুক্তি তর্ক হইতে বিরত হইবে, কল্পনাজল্পনা

প্রবৃত্তিত্যাগ, আত্মচিন্তা পূর্ব্বস্মৃতি পরিহার করিবে; বুদ্ধি হইবে স্থির শান্ত নিথর। এইরূপে জীবের মধ্যে কালীশক্তির প্রতিষ্ঠা হইলে বুদ্ধির অহং আবরণ ভেদ করিয়া উঠিবে জ্ঞানসূর্য্য—সেই অপার্থিব পুণ্যআলোকে উদ্ভাসিত হইবে জীবের সর্ব্ব আধার। এই জ্ঞান প্রকাশ না হইলে বুঝিবে কালীশক্তির উপর বিশ্বাস এখনও দৃঢ় হয় নাই—সর্ব্বকর্ম্ম মায়ের ইচ্ছা একথা তখনও সম্যক্ ধারণ করিতে পার নাই—অতএব গুরুমুখ করিয়া আত্মসমর্পণ-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে।

জ্ঞানের লক্ষণ কি? জ্ঞানের উপকারণাদিই বা কোন্গুলি? তাহাদের কিরূপে ব্যবহার করিলে জ্ঞান লাভ লইবে? ইত্যাদি বিষয় এইবার বিবৃত করিব।

বুদ্ধির মুখের হিরণ্ময় পাত্রখানি উন্মুক্ত হইলেই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান তোমার ভিতরেই, কেবল অপ্রকাশ আছে মাত্র, সাধন সাহায্যে ইহা প্রকাশ হইবে। জ্ঞান প্রকাশ না হইলে সব সাধনভজন নিরর্থক। সর্ব্বাগ্রে চাই কালী, মাতৃশক্তি, চাই আদ্যাপ্রকৃতি—তার পরই চাই সত্যসূর্য্য—আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান। এ জ্ঞানমহিমা পাশ্চাত্যের মস্তিষ্কে এখনও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য জানে ক্রমাগত বহির্জগতের সম্পর্কে থাকিয়া জগতের জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, বুদ্ধিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়। আমরা বলি, জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, আত্মচৈতন্য দ্বারা আমরা জগৎকে বুঝি, জগতের আদিকারণ বিদিত হই, আপনার চৈতন্য দিয়াই বাহিরের চৈতন্য উপলব্ধি করি। আমরা জানি একই পরম ব্রহ্মে নিখিল ভুবন অধিষ্ঠিত—একই মহাকারণ হইতে উদ্ভূত সমুদয় সৃষ্টি-সংসার—সে সৃষ্টির অভিব্যক্তি আমি, তুমি, অনন্ত স্থাবর জঙ্গম, গ্রহতারা ইত্যাদি—এই কারণজ্ঞানই অনন্ত অসীম অফুরন্ত। আত্মসমর্পণযোগের প্রথম সিদ্ধি হইতেছে এই জ্ঞানলাভ।

এইখানে সৃষ্টিরহস্যের গোটা দুই কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। এই যে ধারণাতীত বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি, ইহা একদিন চিৎশক্তির কুক্ষিগত ছিল—এই আদ্যাশক্তি ইহার প্রসূতি। জ্ঞান অজ্ঞান পাপ পুণ্য, অনিল অনল, বৃক্ষগুল্মাদি যাহা কিছু সবই ভাবাকারে এইখানে অবস্থান করিত। সে তিমিরবরণা কালী গভীর আঁধারে আপনাকে ঢাকিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; সেখানে না ছিল নাম, না ছিল রূপ, না ছিল গুণ, কিন্তু ছিল এক মহাভাব যাহা অনাদিকাল ধরিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, এখনও ফুরায় নাই। এই মহাভাব লইয়া মহতের সৃষ্টি। ইহাই জগতের ছাঁচ অর্থাৎ কারণ, এইখানেই ভাব, নাম রূপ গুণ প্রাপ্ত হইল। কারণই হেতুবোধক, আদর্শ নির্ম্মল সত্য জ্ঞানময় অবস্থা। তারপর ফুটিয়া উঠিল সূক্ষ্মজগৎ, কারণের নামরূপগুণকে সম্ভবপর পরিবর্ত্তন করিয়া, রূপান্তর করিয়া বস্তুতন্ত্র করিবার পথে, ক্রমবিকাশের পথে স্থাপন করিল।

স্থূলেই সৃষ্টির প্রকৃত রূপান্তর, পরিণতি, পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ—কারণে কোনও বিকাশ নাই, কোনও বিবর্ত্তন নাই, সেথায় সকলই পূর্ণ, অবিকৃত, সনাতন। কারণই সত্য। সূক্ষ্মে সমস্তের বিকাশের জন্য আয়োজন চলে, কল্পনা জল্পনা চলে; তাই তাহা অনৃতপূর্ণ স্বপ্নবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইলেও, কারণের পূর্ণসত্য সেখানে নাই অথচ কল্পনা সেখানে বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই, স্থূলে বিকশিত হয় নাই। স্থূলে সমুদয়ের বিকাশ কিন্তু অনন্ত পূর্ণসত্যের খণ্ড বিকাশ মাত্র, তাই সেখানে ক্রমাগত অতীত আংশিক বিকাশকে অনৃতে পরিণত করিয়া ধ্বংস করিয়া, পূর্ণতর সত্য, পূর্ণতর সৃষ্টির প্রকাশ চেষ্টা চলিয়াছে।

এক্ষণে জ্ঞান অর্থে এই সৃষ্টিলীলাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা। সৃষ্টি ত্রিবিধ-স্তর-সমন্বিত বলিয়া কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই তিনটিকে আমাদের একই জ্ঞানের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দিয়া বুঝিতে হয়। স্থূল-জগৎ আমরা বুঝি

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন দিয়া, সূক্ষ্ম-জগৎ বুঝি বুদ্ধি, মেধা, বিচার সহযোগে; কারণ-জগৎ বুঝি প্রজ্ঞার দ্বারা, প্রতিবোধের দ্বারা। এইরূপে মনের সাহায্যে স্থূল, বুদ্ধির সাহায্যে সূক্ষ্ম এবং প্রজ্ঞা দিয়া কারণতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। মন দিয়া যে জ্ঞান, উহা লইয়াই জড়-বিজ্ঞান; বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জগৎকারণকে উপলব্ধির নামই যোগ।

সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়পথে মন দিয়া জগৎ সম্বন্ধে বাহ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে; সেই বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করে, তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বের অবধারণ করে বুদ্ধি দিয়া; পরে জ্ঞানের রাজ্যে আরোহণ করিতে প্রয়াস পায়। যোগী কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই ভাব উপলব্ধি করে, অর্থাৎ বিষয়টীর মূলতত্ত্ব আপনার মধ্যে অনুভব করে, পরে সেই স্বানুভূতিলব্ধ ভাব সম্বন্ধে চিন্তা করে, অনন্তর সেই ভাবের অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরম্ভ করেন মন হইতে; যোগী ঊর্দ্ধলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করেন। আজ সাধককে এই জ্ঞানক্রিয়া সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে বস্তুর ভাবকে আত্মানুভূতিগত করিয়া বিদিত হওয়া, পরে তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য বুঝিবার জন্য চিন্তা করা; অতঃপর স্থূলের প্রকাশ সম্বন্ধে বাহ্যোপলব্ধি দ্বারা আপনার জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে ভাব, পরে চিন্তা, পরিশেষে প্রত্যক্ষ।

৫

কোনও বিষয়-বিশেষের পূর্ণ জ্ঞান লাভ কিরূপে হইবে? সর্ব্বাগ্রে সাধারণ পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা যাউক। সচরাচর জ্ঞান তিন প্রকার;

ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক। উক্ত তিন প্রকার জ্ঞানই ভ্রমাত্মক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জ্জন করি তাহা প্রমা নহে, কেন না শুক্তিতে রজত জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রতারিত হইয়া আমরা যে সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে যে-সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহারই কষ্টিপাথরে ইন্দ্রিয়সমন্বিত বিষয়-বিশেষকে মাজিয়া ঘসিয়া আলোচনা করিয়া গ্রহণ করাই যৌক্তিক জ্ঞানের কাজ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই তাহার ভিত্তিস্বরূপ এবং তাহাই তাহার প্রতিপাদ্য, সুতরাং সদোষ সসীম ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া যুক্তি তর্ক, বিষয়-বিশেষের নির্ম্মল স্বরূপ সত্যকে প্রদান করিতে পারে না। ঔপদেশিক জ্ঞানে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির সাহায্যে বুদ্ধির বিকাশ হয় মাত্র, কিন্তু তাহাও ইন্দ্রিয়াদির দাস—প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ নির্ভুল ভাবে শাস্ত্র গ্রহণ করিলে তবে ত বুদ্ধি নির্ভুল শাস্ত্রবিচার করিবে? বিশেষতঃ শাস্ত্রাধ্যয়নে শাস্ত্রের ভাষাবোধ জন্মে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মোপলব্ধি করা প্রত্যক্ষানুভবী ব্যতীত কেবল পণ্ডিতের পক্ষে অসম্ভব। অতএব যোগজ যে জ্ঞান তাহাই প্রমা, তাহাই সত্য। এই জ্ঞান, ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। উদাহরণ দ্বারা সাধারণভাবে বিষয়-বিশেষের জ্ঞানার্জ্জন এবং যোগপদ্ধতি অনুসারে বস্তুর স্বরূপ-নিরূপণ প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধরুন, আপনার রূপ দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, এক্ষেত্রে দর্শনশক্তি দিয়াই আপনার রূপ আমার অন্তরে প্রবেশলাভ করিল। তারপর আপনার বাক্য শ্রবণ-বিবরে অমৃতবর্ষণ করিল—সে কি মিষ্ট, কি মধুর; আপনার অঙ্গসৌরভে আমি উন্মাদ হইলাম—আপনার কোমল, সুঠাম দেহখানির স্পর্শলালসায় আমার সর্ব্বস্ব হর্ষভরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—আর আমি স্থির থাকিতে

পারিলাম না, দৃঢ় আলিঙ্গনে আপনাকে বদ্ধ করিলাম, আপনাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিলাম। আপনি, এই সুযোগে আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেন—হয়ত, এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়াই আপনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে আমি ত তাহা বুঝিলাম না, আপনার গুণের পরিচয় না লইয়া এইরূপ করিলাম কেন? অবশ্য বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়গুলিই ইহার কারণ। ইহাই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান।

অতএব ইন্দ্রিয়জয়ী হইলে এতটা নির্ব্বোধ হইতাম না। ভবিষ্যতে সাবধান হইলাম, মানুষ চিনিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিলাম, যে-সকল লক্ষণ দেখিলে পূর্ব্বে ভালবাসারই পরিচয় বলিয়া প্রতীতি হইত, এখন হইতে সংশয়ের চক্ষে তাহা গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তির অন্তর-বাহির না বুঝিয়া আর কাহারও নিকট ধরা দিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। ঘটনাচক্রে কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহার আকৃতি, মুখাবয়ব, তাহার উচ্চারিত প্রতিবর্ণ, তাহার হাবভাব, মনোযোগ সহকারে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। তাহার ব্যবহার কিরূপ, তাহার সঙ্গী কাহারা, কোন্ বিষয়ে তাহার অধিক আসক্তি, সে কি কথা বলে, কি কার্য্য করে, কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠে তাহার অভিরুচি ইত্যাদি নানা প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এইটুকু বাহ্য অভিজ্ঞা। অনন্তর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম—যত রকম জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে জন্মিয়াছিল সেই সকল দিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। ঠিক করিলাম, এই ধরণের লোকগুলি প্রায়ই দুষ্ট হয় অতএব তাহার সঙ্গ করা উচিত নয়, না-হয় সৎলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই যে মানুষ ভুল করিয়া থাকে, আমি এরূপ বলি না—এমন কি এতটা পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই অনেক স্থলে আমরা মনের মানুষ পাইয়া থাকি, ইহাও সত্য কথা। কিন্তু এত বিচক্ষণ-

তার পরও আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই, যাহাকে অনেকদিন ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিলাম, সেই অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মানুষ বিষয়-বিশেষের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে; মানুষ সম্বন্ধেও যেমন, কোন দ্রব্যাদির বিষয়েও তাই। প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বস্তুটিকে মনের মধ্যে লইয়া আসা হয়, পরে যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানের আলোকে উহাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তদ্বিষয়ে মিথ্যাই হউক সত্যই হউক, একটা জ্ঞান লাভ করে। বস্তুতঃ, সে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় মাত্র—কারণ তাহার সিদ্ধান্তটি ঠিক হইল কি না, এমন কি তাহার এই সমগ্র চিন্তাপ্রণালীটির মধ্যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশটুকু ছাড়া নির্ভুল ও সত্য কিছু রহিল কি না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বাহিরে যাহা কিছু, সমস্তকেই সাধারণ মানুষ সংশয়ের চক্ষে দেখে; ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যাহা সে প্রত্যক্ষ করে, অথবা সেই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যতটুকু মিল আছে, ততটুকু ছাড়া কোনও কিছুকে সে নিঃসংশয়িত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত।

কিন্তু যোগী কোন-কিছুর স্বরূপ নির্ণয় করে অন্য প্রকারে। তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত নহে—কোনও হেতু দর্শনে তাহার জ্ঞান আগমন করে না, বুদ্ধির এইরূপ নিরন্তর অনুশীলনের ফলে যখন প্রতিপদে বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা চক্ষে পড়িতে থাকে, যখন সে প্রতিক্ষেত্রে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে মহাশক্তির নিকট আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া নিষ্ক্রিয় হয়, শুষ্ক তৃণরাশির নিম্নে অগ্নি থাকিলে বায়ুসঞ্চারে তাহা যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, যোগীর বুদ্ধির আবরণ সহসা ভেদ করিয়া এমনই একটা প্রতিভা ফুটিয়া উঠে—তাহা নির্ম্মল, সর্ব্বাবভাসক যোগজ্ঞান।

যোগী তাহার এই অদ্ভুত প্রজ্ঞাশক্তি যে-কোন বিষয়ের উপর আরোপ করে, বিষয়টির নাম রূপ গুণ কিছুই প্রত্যক্ষ করিবার আবশ্যক হয় না, আপনার সত্ত্বা দিয়া উক্ত দ্রব্যের সত্ত্বার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় ; যে মহাকারণে তাঁহার আপনার প্রতিষ্ঠা, সেই একই স্বরূপের উপর যাবতীয় বস্তুর বিকাশ বলিয়া সহজেই যোগী পদার্থ বা মানুষের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া ফেলে। অবশ্য এইরূপ শক্তিলাভ অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

বিষয়টী আপাততঃ বড়ই জটিল এবং কঠিন—কারণ আমরা স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় ও বিচার বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারাই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অভ্যস্ত, এতদ্ব্যতীত আমাদের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রজ্ঞাশক্তি আছে তাহা ধারণার মধ্যে আনিতে পারি না। কিন্তু বুদ্ধি পূর্ণভাবে সেই অজানিত অনন্ত শক্তির উদ্দেশ্যে ধ্যানরত হইলে, শক্তির উপর অগাধ শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধি ও মন যখন শুদ্ধ ও শান্ত হয়—তখন প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারাই আমরা সকল কার্য্য করি। বস্তু বা কোন ব্যক্তির বাহ্য অবয়ব বা তাহার কোন আচরণ লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্মুখী ভাবের দ্বারাই তাহাদের অন্তরপ্রকৃতির পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হই।

পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইলে, এই কথাগুলি সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। কারণ-জ্ঞান জন্মিলে কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ আধারে, কারণ মধ্যস্থিত অব্যক্ত ভাবের কতটা প্রকাশ সম্ভব, তাহা ভাবের দ্বারা উপলব্ধি হইবে—মানুষের বাহির দেখিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিবার তখন আর আবশ্যক হইবে না। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে বলিব।

যোগী ঘটনাই হউক, পদার্থই হউক, মানুষই হউক, তাহার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করিতে উদ্যোগী হইলে, প্রথমেই গতানুগতিক অভ্যস্ত পন্থাটি পরিহার করিয়া বিষয়টির ভাবের সহিত আপনার ভাবকে মিলাইবার চেষ্টা

করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে ভাবিয়া লয়। প্রথমে ইহা বৃথাই বোধ হইবে। যেমন নিরক্ষর ব্যক্তি একদিনেই পুস্তকপাঠে সমর্থ হয় না, সময় লাগে, অভ্যাসযোগেও ক্রমশই ভাবের মধ্যে বস্তুটির অধ্যাত্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে—এই অধ্যাত্মতত্ত্বই কারণ, যে কারণের উপর ইহা অবস্থিত।

অনন্তর বুদ্ধির দ্বারা সেই ভাবমধ্যস্থিত অব্যক্ত জ্ঞানকে চিন্তার মধ্যে আনিতে হইবে। এই স্থানেই ভাব সম্ভবপর বিকাশপ্রাপ্ত হয়। অনুভূত অব্যক্ত জ্ঞান বাক্‌বদ্ধ হইয়া সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করে। ইহারই নাম চিন্তা। অধিকাংশ লোকেই একান্ত অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে, অসম্পূর্ণ বাক্যে, আংশিক অর্থে তাহাকে অর্দ্ধস্ফুট করে মাত্র। যোগী কিন্তু এইরূপ করে না।

তাহার চিন্তা সুপরিস্ফুট, সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত হওয়া চাই। চিন্তা না করিলেও যোগী স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু কখনও সে চিন্তা করিলে, সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ভাবেই চিন্তা করিয়া থাকে।

প্রয়োজন হইলে যোগী বিচারও করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মত নহে। সে দর্শন করে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নহে, সর্ব্বান্তর্যামীর চক্ষু দিয়া—ঐ ঐশশক্তি সম্পন্ন প্রত্যক্ষ, ঐ দৈবদৃষ্টিই তাহাকে অর্থযুক্ত ভাব প্রদান করে। এই ভাবের প্রেরণা, দেবতার প্রত্যাদেশস্বরূপ যোগীর মুখে ও লেখনীতে ভাষাকারে বহির্গত হয়—এই প্রত্যক্ষবোধই তাহাকে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত করে এবং বিবেক, ভ্রান্তি ও অসত্য হইতে সতত তাহাকে রক্ষা করে। যদি তর্ক করিতে হয়, সাধারণ তার্কিকের মত তর্কশাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থানুসারে যুক্তির পর যুক্তির প্রয়োগ করিয়া অতি কষ্টে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে যায় না। তাহার শুদ্ধ বুদ্ধিতে ভগবানই উপযুক্ত যুক্তি-পরম্পরা প্রেরণ করেন; যোগী ভগবানের সেই প্রত্যাদেশই সরল

এবং সুস্পষ্ট ভাবে লোক সমাজে প্রকাশ করে। সেই জন্য যোগীর কথা ক্ষুরধার সদৃশ, জীবন্ত এবং জ্বলন্ত।

যোগী কোন বিষয় না দেখিয়া কেবল ভাবমাত্র অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, ঐ বস্তুর বাহ্যবিকাশের সহিত সেই জ্ঞান মিলাইয়া লয়। এই মিলাইয়া লওয়ার জন্য কেহ যেন মনে না করেন, যে যোগী তাহার অমানুষী যোগশক্তির দ্বারা যে সঠিক জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার কোনও সংশয় আছে। যোগী কেবল মানুষের বাহ্য বিকাশে, তাহার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতার কতটুকু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই দর্শন করে। কেন না, যোগী জানে, মানুষের অন্তঃস্থিত অসীম ভাবরাশি সম্পূর্ণরূপে এককালে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। তাহার অন্তর্দৃষ্টি যে সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহারই ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে—ইহা দেখিয়া আনন্দলাভ করে মাত্র।

যোগের গতি অনুসারে যোগী অনাগত ভবিষ্যতের সকল তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের মূর্ত্তিমাত্র দর্শন না করিয়াও তাহার বিষয়ে সকল কথা বলিয়া দিতে পারে, একস্থানে বসিয়া জগতের সর্ব্বত্রে কি ঘটিতেছে, কি ঘটিবে প্রভৃতি অনায়াসে বিদিত হয়।

প্রধান কথা, মানুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের যে সম্বন্ধসূত্র আছে, বুদ্ধি ও মানসসত্তাকে স্থির করিয়া সেই মহান্ সূত্রটি অবলম্বন করিতে হইবে; সমগ্র জগতের সুর সেই সূত্রে অনাহতভাবে ধ্বনিত হইতেছে—বাহিরের কোলাহল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলেই আমরা অনায়াসেই সেই মোহন-বাঁশী শুনিতে পাইব। এক্ষণে কথা হইতেছে, এইরূপ সর্ব্বদর্শী হইবার জন্য আমাদের মনে যেন কোন বাসনা জাগিয়া না উঠে; আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহা বলা হইতেছে এ সমস্ত যোগসিদ্ধির একটা স্তর মাত্র। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, ঐ প্রকার লক্ষণ অল্পবিস্তর আমাদের চরিত্রে ফুটিয়া

উঠিবে—এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বুঝিব আমাদের যোগ কার্য্যকরী হইতেছে কি না ?

অবশেষে বক্তব্য—যোগীকে মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা মন দিয়া জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত, ভাবরূপে জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি এবং মনরূপ দ্বার দিয়া উহা প্রকাশিত হয় মাত্র। আত্মসমর্পণযোগী কালীশক্তির হস্তে সকল যন্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইলেই এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই বুদ্ধির ধারণা-সামর্থ্য জন্মিবে, খণ্ডতা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বজ্ঞানের আধার হইয়া উঠিবে।

৬

এইবার মনের কথা বলিব। যোগগ্রহণাভিলাষী সাধককে অন্তরস্থিত এই সূক্ষ্মযন্ত্রগুলিকে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। মন সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত থাকিলেও ইহা অবধারিত যে মনই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। শাস্ত্রকারগণ মনকেও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন এই ইন্দ্রিয়গুলির পশ্চাতে সর্ব্বদা না থাকিলে কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম কিছুই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয় না। এইজন্য মনকে বিশুদ্ধ করিয়া না তুলিলে আমাদের দ্বারা ভগবদ্‌কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

সাধকের ভিতর জ্ঞান প্রকাশ হইলেই, শক্তি মানস ক্ষেত্রে অবতরণ করে। শক্তিসাধকের ইহাই তৃতীয় অবস্থা। প্রথম, কালীশক্তিকে

আবাহন এবং তাহার উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণের সঙ্কল্প। দ্বিতীয়, কালীশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ। তৃতীয়, বুদ্ধি ও মনের অশুদ্ধতা দূর করিয়া, তাহাদিগের স্থলে জ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠিত করা।

পূর্ব্বে জ্ঞানপ্রকাশের লক্ষণ, প্রণালী প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে মন সম্বন্ধে বলিব।

সূক্ষ্মযন্ত্রগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য আমরা তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম—যথা, (১) ইচ্ছাশক্তি, (২) জ্ঞান, (৩) বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি ও (৪) মন। এস্থলে মন এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। যদিও বুদ্ধি হইতে মন ভিন্ন তথাপি তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ যদি কেবল যুক্তি, তর্ক, স্মৃতি, কল্পনা অনুমান প্রভৃতির অধীন হইত, তবে সহজেই ঐগুলি হইতে উদ্ধার পাইয়া বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া উচ্চ-জ্ঞানকেই আশ্রয় করিতে পারিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যের কল্পনা-মন্দিরে মনেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে; সেইজন্য মনকে বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে বুদ্ধিরও সম্যক্ শুদ্ধি অসম্ভব। সাধনকালে মন এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবে না ধরিয়া একই সূত্রে বদ্ধ এইরূপ ধারণা করিতে হইবে।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই লইয়াই অন্তঃকরণ। পূর্ব্বে মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিভাগে উচ্চবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের স্থান দিয়াছি। তন্নিম্ন স্তরদ্বয়—বিচারবুদ্ধি এবং বোধশক্তি—এই দুইটিই বুদ্ধি নামে অভিহিত। এই বুদ্ধি, হৃৎপদ্মস্থিত মন, তন্নিম্ন স্তরের চিত্ত এবং এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে যে অহঙ্কার—ইহারা একই সূক্ষ্মবস্তুর চতুর্বিধ বৃত্তি বা তরঙ্গ মাত্র। শাস্ত্রকারগণ কখনও কখনও এই সমষ্টিবস্তুকেই মন এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যে মন অন্তঃকরণ সমষ্টির দ্বিতীয় স্তর, তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

এক্ষণে মনের বিশেষ কার্য্যাদি প্রণিধান করিতে পারিলেই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এইগুলি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, মন অমনি ঐগুলিকে ধারণা করিয়া লয়। সুতরাং কোন বাহ্যবস্তু সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিবার এই দ্বিবিধ ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-গণ বাহ্যবস্তুকে স্পর্শ করিবামাত্র তদ্বিষয়ক একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞা মনে উপনীত হয়—এইরূপ অবস্থায় গৃহীত প্রতিবিম্ব মন হইতে নিরাকৃত হইলেও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন যখন গৃহীত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বোধ করে, অনুভব করে, ইহা এই, উহা এই, এইরূপ নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লয়—তখন বস্তুর যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান—জন্মজন্মান্তরেও তাহার ছাপ সহজে দূর হয় না।

অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না; কোন দ্রব্য নিকটবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়গণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মন কিন্তু ত্রিকালবিহারী, সে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েই বিচরণ করে। অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াশক্তি লোপ পাইতে পারে, কিন্তু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বিনষ্ট হইলে মনের ক্রিয়া ধ্বংস হয় না। মন, কল্পনার চক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া এক বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারে। চক্ষু দর্শন করিবে, কর্ণ শ্রবণ করিবে, এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, কেহই একাধিক শক্তি-সম্পন্ন নয়, মন কিন্তু এককালে সর্ব্ব রস উপভোগ করে। সপ্তবর্ণ সংযোগে যেমন বিচিত্র বর্ণ অঙ্কিত হয়, একবর্ণের কোন আলেখ্যই নয়নরঞ্জক হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ শক্তি থাকায় তাহারা বৈচিত্র্যহীন; মন কিন্তু, কোন্ পুরাকালে বাল্মীকির তপোবনে গৈরিক-বসনাবৃত লবকুশ বীণাযন্ত্রে রামগুণগান করিয়াছিল—পবিত্র তপঃক্ষেত্রের

হরিতকী আমলকী বৃক্ষের পত্রাবলী কেমন হরিত, নীল, পীতবর্ণে সুশোভিত ছিল—তপোবনের পদতল বিধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া স্রোতঃস্বিনী কেমন রজতধারায় প্রবাহিত হইত—সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের আনন্দ কলরব, বন্য বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কুজন—এইসব এককালে শ্রবণ, দর্শন কার্য্য সমাহিত হইয়া উপভোগ করিতে পারে। মনের কল্পনাশক্তি অসাধারণ। চক্ষু, যখন যে দৃশ্য সম্মুখে আইসে, তাহারই প্রতিচ্ছবি মনকে প্রদান করে, মন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য লইয়া এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব চিত্র রচনা করিয়া আপনাআপনি আনন্দ সৃষ্টি করিয়া কতকাল যে বিভোর থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যবন্ধ হইলেও মনের কল্পনালহরী অবিরত চলিতে থাকে।

মন সবজান্তা, আকাশের ঘনঘটা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারে বৃষ্টি হইবে কি না, ধূম দেখিয়া তাহার নিম্নে অগ্নি আছে একথা শপথ করিয়া বলিয়া দিবে—যদিও অনেক সময় মেঘ কাটিয়া যায়, বৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগে ধূমের সৃষ্টি হয়, কিন্তু নীচে অগ্নি থাকে না। অনেক স্থলে বোকা হইয়া গেলেও যাহা সে এতদিন ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভব করিয়া আসিয়াছে, তাহার বলেই সে ত সব বলিয়া দিবে, তারপর তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক।

মনের যে কল্পনা তাহা ঐন্দ্রিয়িক। ইন্দ্রিয়গণের স্পর্শন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির শৃঙ্খলাই মনের চিন্তা। এমন কি আমরা যখন প্রেম, সাহস, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলির কথা মনে করি, অমনি আমাদের চৈতন্যের কথা মনে পড়ে, রাণা প্রতাপ, শঙ্কর, বুদ্ধ প্রভৃতির ধারণাই জাগিয়া উঠে। যাহা দেখে যাহা শুনে তাহারই ধারণা মন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কল্পনা মনের অধিগম্য নহে।

অনেকেই বলেন, মনই চিন্তা করে কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মন,

ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক নীত বিষয় গ্রহণ করে এবং ঐ বিষয়েরই আলোচনা করে। তবে বুদ্ধি হইতে চিন্তার তরঙ্গগুলি যখন চিত্তে অবতরণ করে, তখন মন ঐগুলিকে ধরিয়া লইয়া নিজের ঐন্দ্রিয়িক কল্পনায় তাহাদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া চিত্রবিচিত্র করিয়া তুলে।

মানুষের বুদ্ধিই চিন্তাযন্ত্র। মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হয় বুদ্ধি তাহাতে সফলকাম হইতে পারে। এইজন্য পাশ্চাত্য কোনও কোনও মতে, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে যুক্তির সাহায্যে শৃঙ্খলাবিধানই যে বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা একটি গুরুতর ভ্রম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এইরূপ ঐন্দ্রিয়িক চিন্তা মনেরই কার্য্য। পশুর চিন্তা মনের অধীন—যে চিত্র, যে শব্দ সে অনুভব করিয়াছে, তাহারই বিষয় সে ভাবিতে, কল্পনা করিতে পারে। মানুষের বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্তরের—বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। যোগসাধনার দ্বারা মানুষ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে, কোনও বস্তুর সম্বন্ধে যাহা সে কখনও দেখে নাই, জানে নাই, সেই বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হইতেছে। চিন্তা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বাদীর ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা ইহাদ্বারাই যথেষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে। তাহার ঐ ধারণা প্রকৃত-পক্ষে কেবল মনের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

মনের অশুদ্ধতা—সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তদ্বিষয়ে যে ভাব গ্রহণ করে তাহা বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেয়। সাধারণ স্থলে মনই বুদ্ধিকে পরিচালিত করে, কিন্তু বুদ্ধির উপর হইতে যে সত্য ধর্ম্ম সে লাভ করে মনের এই অশুদ্ধ কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন তাহা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

আবার মনের কল্পনা সকল যে কেবল বাহ্য জগতের দর্শন স্পর্শনজনিত এরূপ নহে, পরন্তু মন বুদ্ধির চিন্তা ও চিত্তের অতীত স্মৃতিগুলিকে লুফিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের মীমাংসা করিয়া লইতে যায়। এইজন্য

যাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য অল্প তাহারা সর্ব্বতোভাবে মনেরই অধীন হইয়া পড়ে। মনের যুক্তি—সে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে তাহাই অবধারিত সত্য। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে সে সর্ব্বদাই অস্বীকার করিয়া থাকে।

সাধারণ মনের অবস্থাগুলিকে সংক্ষেপে ধারণা করা যাউক। প্রথমতঃ সে ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নীত বাহ্য-স্পর্শগুলি (sensation) সম্বন্ধে অভিজ্ঞা গ্রহণ (percept) করে; তৎপরে তাহাদের ধারণা করিতে গিয়া ইহা এই, উহা এই প্রভৃতি প্রকারের মন্তব্য সৃষ্টি করিয়া লয়, ভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে নামাঙ্কিত করিয়া লয় (Concept); দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধির যে চিন্তা এবং চিত্ত-ভাণ্ডারের যে পূর্ব্ব স্মৃতিরাশি, সেইগুলিকে লইয়া অনবরত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মিলাইয়া লয়—বাহ্যজগতের জ্ঞানের সঙ্গে যাহা মিলে না তাহা অসত্য, এইরূপ বলিয়া পরিত্যাগ করে।

এক্ষণে এই মন লইয়া যোগী কি করিবে? প্রথমেই মনকে প্রশান্ত করিতে হইবে, মনের অবিচ্ছেদ তরঙ্গমালা দমিত করিতে হইবে—মানস-ক্ষেত্র চঞ্চল থাকিলে অল্প জ্ঞানলাভ হইতে পারে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শান্ত মনই যোগীর সাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক।

কিন্তু মন যাহা ধারণা করিয়াছে, যেটুকু সে চিন্তা করে, সেগুলিকে না হয় মোছা হইল; প্রত্যুত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আনীত বিষয়স্পর্শে মনের যে খেলা তাহা নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া? আমরা ত ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সমাধির দ্বারা মনকে সর্ব্বতোভাবে শান্ত করা যায়, এইজন্যই বৈদান্তিকগণ সমাধির উপর অধিক-তর অনুরাগী—এই উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনের নিরন্তর গতি বন্ধ করা যায়।

কিন্তু যদি তুমি সমাধির দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিতে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে—সর্ব্বসঙ্গ বিরহিত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে

হইবে—জগৎ এবং ভগবান্ এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট পূর্ণচ্ছেদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই কি সত্য, স্বাভাবিক? স্বভাবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অস্বাভাবিক দুর্গমপথে যোগারোহণ করা যোগীর কর্ত্তব্য নহে, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে ভেদ না দেখিয়াই আমাদের সাধন প্রবর্ত্তন করা বিধেয়।

সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান যুগে তন্ত্রই মহৎ পথ। তান্ত্রিকরা জানে সমাধি মন স্থির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায় নহে। তান্ত্রিক তাহার অন্তঃকরণ এরূপভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, যাহাতে তাহার দর্শন, স্পর্শন, ভ্রমণ, আহার, নিদ্রা কিছুই নিরুদ্ধ করিতে হয় না, সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন এই, সকল কার্য্য যথারীতি করিতে থাকিব অথচ মন স্থির হইবে কেমন করিয়া? তান্ত্রিক তাহার মনকে যে কেবল দৃঢ়মূল ধারণা, ঐন্দ্রিয়িক কল্পনা প্রভৃতি কার্য্যতৎপরতা হইতে মুক্ত করে তাহা নহে অধিকন্তু মনের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণকারী কর্ম্মশীলতা, তাহাও বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাউক। যোগী দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে মন দিয়া নয়, বুদ্ধিসংস্থিত ইন্দ্রিয়শক্তিদি য়া; ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া জগতের সর্ব্ববিষয়ে সঞ্চরণ করিবে—মনের পরিবর্ত্তে জ্ঞানোদ্ভাসিত বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিবে মাত্র। এইরূপ হইতে থাকিলে জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন্ লক্ষ্য হয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুন্দরতর, সুস্পষ্টতর হইয়া উঠে; তাহাদের অতি সূক্ষ্মাংশ পর্য্যন্ত লক্ষ্যীভূত হয়; বস্তুগুলি এক দিব্য সত্য সত্তায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে সারথীরূপে দণ্ডায়মান হইলে, তখন যাহা দেখা যায় শুনা যায় তাহা কি সুন্দর, কি সুমধুর,—এক কথায় পূর্ব্বে তাহাকে এরূপ ভাবে দেখা হয় নাই, শ্রবণ করা হয় নাই। একটি পত্রের উজ্জ্বল বর্ণে,

একটি ফুলের মধুর সৌরভে, একটি পাখীর কলকাকলীতে যে আনন্দ, যে রস আস্বাদ হয়—তাহা পৃথিবীর নহে, স্বর্গের। তখন সাধক বুঝে এ পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে—এইখানেই যে লীলাময় ভগবান্ বিহার করিতেছেন—এইখানেই যে তাহার আরাধ্য, তাহার চিরবাঞ্ছিত দিব্য রত্ন তাহারই সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছেন—তখন সাধক দেখে ইন্দ্রিয়গণ অবাধ মুক্ত। এই মুক্ত ইন্দ্রিয়পথে পার্থিব সকল বস্তুর প্রতিকৃতির মধ্যে বিশ্ব আত্মার যে গুণ, যে আনন্দ, যে বিকাশ বর্ত্তমান তাহা দেখিতে পায়। এই যে বুদ্ধিস্থিত ইন্দ্রিয়ের নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌম শক্তি, ইহা যোগপথের প্রাকাম্য নামক খণ্ডসিদ্ধিরই অন্তর্গত। যোগ পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিলে দেখিবে মন আর বিরক্তির কারণ নহে, ইহা একটি মুক্ত দ্বার বিশেষ, ইহার ভিতর দিয়া বুদ্ধি চিত্তের নিকট সমাচার প্রেরণ করিতেছে, এই সমাচার লুটিয়া লইবার অসুর আর মনের মধ্যে নাই—মন শান্ত ধীরভাবে আপনার উপর দিয়া সেতুরূপে তাহা বহন করিতেছে মাত্র।

এইরূপে মনকে স্থির করিবার বহুবিধ উপায় বিদ্যমান আছে—কিন্তু সে সকলেই এই দোষটি দেখা যায় যে তদ্দ্বারা মনের যে অংশ বুদ্ধির কার্য্যানুসরণ করিয়া চিন্তা করে, তাহাকে বন্ধ করিলেও তাহার অববোধশক্তি থাকিয়া যায় অর্থাৎ মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রভুরূপে দেখিতে শুনিতে থাকে, এইজন্য মন প্রকৃষ্টরূপে স্থির হয় না, সুতরাং যোগসাধনার সম্যক্ ক্ষতি হইতে থাকে।

আত্মসমর্পণযোগে, কালীশক্তির দ্বারা এককালে জ্ঞানকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে হইবে ও মনকে স্থির করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে দুইটি সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রথমতঃ, গতানুগতিক প্রথার মত মনকে খালি করিতে হয় না, যদিও এইরূপ করা খুব ভাল কিন্তু তাহা অতীব কঠোর ও কষ্টসাধ্য তপস্যা। সহজে ধীরে ধীরে বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিবে—জ্ঞানালোকে বুদ্ধির চিন্তাকারী শক্তিকে খর্ব না করিয়া তাহাকে উচ্চচিন্তাভিমুখী করিয়া দিবে—তাহা হইলেই তাহার ক্ষুদ্রতা এবং সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া গিয়া সে দেবস্বরূপ হইবে। আর মনের কার্য্যরোধ না করিয়া তাহাকে বুদ্ধিগত বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিয়াই শুদ্ধ করিবে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণকারী শক্তিকে ধ্বংস না করিয়া প্রাকাম্য শক্তিরই ক্রিয়াশীলতা তৎস্থলে ফুটাইয়া তুলিবে। দ্বিতীয়তঃ, সুষুপ্তির মধ্যে না থাকিলে বিষয়স্পর্শ বন্ধ হয় না—চিন্তাধারা রুদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু কেবল চিন্তাশূন্য হইলেই মন স্থির হয় না, জ্ঞানপ্রকাশ না হইলে মনের এই অনধিকার চর্চা, এই যোগপ্রতিবন্ধকতার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারা যায়? জ্ঞান উদ্দীপিত হইলেই মন নিস্তরঙ্গ হইবে, কেননা জ্ঞানালোকেই সাধক দেখিতে পায়, স্বাভাবিক বিষয়-প্রতীতিগুলি বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই প্রাকাম্য প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

৭

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মন ও বুদ্ধির শুদ্ধি অসম্ভব। মনের পরই চিত্ত সম্বন্ধে সাধকের ধারণা সুস্পষ্ট থাকা চাই।

স্বভাবতঃ চিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত। মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভোগের এবং বুদ্ধির চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি সবগুলির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের প্রবাহভাবে একপ্রকার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] (Emotion) বলা হয়। [illegible]

[illegible]

যায়; মানুষ আবার জন্মগ্রহণ করিলে মূলাধারস্থিত ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে বলবান হইয়া জীবকে জুড়িয়া ধরে। চিত্তের এই দুইটি ভাগের বিষয় একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

চিত্তের প্রথম যে স্তর, তাহা আবেগের ক্ষেত্র। কালীশক্তির ইচ্ছাতেই এই আবেগের সৃষ্টি। আবেগ না জন্মিলে জীবের কোন কার্য্যে উৎসাহ হয় না। বদ্ধজীব যে কার্য্য করে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে কালীশক্তির প্রেরণায় নহে—বাসনা এবং আবেগ এই দুইটি জীবকে কার্য্যক্ষেত্রে উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই আবেগ কিরূপে জীবের চিত্তে সমুৎপন্ন হইয়া কার্য্য করে।

চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থই বিশ্বজননীর হাতের যন্ত্র, তাঁহার ইচ্ছাতেই সঞ্চালিত হইতেছে—এই যে আমরা অনন্ত প্রকারের কর্ম্মসৃষ্টি করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রিয় অপ্রিয়, ভাল মন্দ নানা অভিনয় করিতেছি, ইহা কি আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না মায়ের লীলা? আমাদের ইচ্ছায় যদি আমরা একটি তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও না হয় এই বিশ্বশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির উপর আস্থাস্থাপন করিতে পারিতাম। উপনিষদের ঋষি উপাখ্যান অবলম্বনে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"কেনেষিতং পততি, প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।"

সেই কালীশক্তির ইচ্ছাই যে আবেগরূপে জীবের চিত্তে স্পন্দনের সৃষ্টি করে, তাঁহারই ইচ্ছায় যে আমরা সকল কার্য্য করিতেছি—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যই যোগ সাধনার আবশ্যক।

চিত্তে যে আবেগের উদয় হয়, তাহা তিন প্রকারের—ভাবের উদ্দীপনা, অনুভূতির উদ্দীপনা ও কর্ম্মের উদ্দীপনা।

প্রথম, মায়ের ইচ্ছা সহস্রদল হইতে বুদ্ধিকে ডিঙ্গাইয়া কখন কখন জীবের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া একরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করে—তাহাকেই ভাবের উদ্দীপনা বলে। কখন সহজ প্রেরণারূপে, কখন প্রত্যাদেশরূপে জীবের চিত্তে এই যে ভাবের উদ্দীপনা তাহা জীবকে কোথাও কবি কোথাও ভক্ত, কোথাও প্রতিভাবান্, কোথাও বা বিশ্বাসী করিয়া তুলে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাবোদ্দীপনা যথেষ্ট উপকারী বটে, কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহা অতি অনিষ্টপ্রদ। কেননা প্রকৃতপক্ষে কালীর ইচ্ছা হইলেও তাহা বুদ্ধির অলক্ষিতভাবে চিত্তে আসিয়া উপনীত হয়, তখন চিত্তের বহু পূর্ব্ব-স্মৃতি সংস্কার, ভাবের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং যখন বুদ্ধিতে গিয়া পুনরায় আঘাত করে, তখন নানা ভাব ও কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া বিকৃত আকারে পরিণত হয়; ফলে ঐ ভাবোদ্দীপনায় জীবের ভিতর দিয়া মায়ের অসম্পূর্ণ লীলাই প্রকাশ পায়। কিন্তু যোগী চায়—শুদ্ধ লীলা, অবিকৃত আনন্দ, পরিপূর্ণ দেবজীবন।

তারপর অনুভূতির স্পন্দন। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে আবেগ (Emotion) বলা হয়। দশ ইন্দ্রিয়কে দশ দিকে ছড়াইয়া, মন এবং বুদ্ধির যে কার্য্য তাহারই আঘাতে চিত্তে যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহাকেই অনুভূতির উদ্দীপনা বলে। এক্ষণে বুঝিতে পারিবে—মন এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কেন কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। ভাবের উদ্দীপনা যেরূপ চিত্তে আসিয়া বিকৃতদশা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ মন এবং বুদ্ধির চিন্তাও চিত্তের অশুদ্ধ আবেগে সেইরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ পায়। সেইজন্যই যোগীকে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমগ্র আধারযন্ত্রটিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

এই অনুভূতির উদ্দীপনা আবার দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য। যাহা সত্য, তাহাই নিত্য, বিকৃত যাহা তাহা অচিরস্থায়ী, অনিত্য। প্রেম সত্য জ্ঞানানুমোদিত, মানুষের বিবর্ত্তনধারায় তাহা অবিকৃত থাকে, ঘৃণা প্রেমেরই অজ্ঞানপ্রসূত বিকার মাত্র। তেজস্বিতা সত্য, ভীরুতা বিকার; পরদুঃখকাতরতা করুণা নিত্য, পরশ্রীকাতরতা নিষ্ঠুরতা অনিত্য, যাহা নিত্য তাহাই ধর্ম্ম, আর অনিত্যই অধর্ম্ম। অবশ্য যাহা বলা হইল ইহাই সনাতন আদর্শের কথা—লৌকিক অথবা সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় এখানে উল্লিখিত হয় নাই। আবার এই অনিত্য বিকারগুলিরও কিছু আবশ্যকতা আছে, কেননা বিকৃতের মধ্য দিয়াই মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর নিত্য ধর্ম্মের পথে চলিয়াছে। এই অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধর্ম্মের আশ্রয়ই যোগীকে করিতে হইবে।

অতঃপর কর্ম্মের উদ্দীপনাগুলির কথা। সাধারণ জীব আবেগপরবশই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রেম, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি উত্তেজক বৃত্তিগুলিরই প্রোতনায় মানুষ উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। অশুদ্ধ জীব শুদ্ধ বৃত্তির যে আস্বাদ তাহা জানে না; জীবের কামনা বাসনা না থাকিলেও যে কার্য্য করা যায়, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইবার চিত্তের দ্বিতীয় স্তরের কথা। আমরা যাহা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, বোধ করি, অনুভব করি, সেই সকলেরই ছবি এই স্তরে অঙ্কিত হয়। মরণকালে সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিকে লইয়া আমরা মহাপ্রস্থান করি। যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করি, পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবৃত্তিগুলি সংস্কাররূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কখন কখন যে সকল অন্যায় কার্য্য করি তাহা ঐ সংস্কারের ফল। যোগী, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি দর্শন করে—যোগের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি নিবীর্য্য হইয়া পড়ে।

এক্ষণে এই চিত্তকে লইয়া যোগী কি করিবে? ইহজন্মের প্রবৃত্তির উৎপীড়নেই সে ব্যতিব্যস্ত—আবার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার তাহাকে নানা মত, নানা ভাব, নানা ধারণার বশবর্ত্তী করিয়া যোগের সরল পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। যোগী যেরূপে বুদ্ধি এবং মনকে শান্ত করিবার জন্য কালীর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে, চিত্তকেও সেইরূপে দর্শনমাত্র অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। কালী যেমন বুদ্ধিকে সৃষ্টি করিয়াছেন চিন্তা করিবার জন্য, কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার জন্য নয়, চিত্তকেও সেইরূপ তাঁহার শুদ্ধ ইচ্ছার আবেগ ধারণ করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন—তাহাকে কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে হয় না, চিন্তা কিম্বা ভাবও সৃষ্টি করিতে হয় না। ভাবোচ্ছ্বাস মানুষের কার্য্যকে স্বভাবানুযায়ী রঙ্গীন তুলিকায় রঙ্গাইয়া তুলে মাত্র; মানুষ ভরিয়া উঠে প্রেমে, সাহসে, মহত্ত্বে, সত্য অভিলাষে, আত্মবিশ্বাসে—কিন্তু সেইগুলিই জীবনের কার্য্যের নিয়ামক হয় না। কোনও বিশেষ উত্তেজনায় পড়িয়া যোগী কার্য্য করে না—তাহার কর্ম্ম হয় পুরুষের ইচ্ছায়। বিজ্ঞানময় কোষ দিয়া কালীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবে মা কোন্ কার্য্যটি কেন এবং কিরূপভাবে করিতেছেন এবং চিত্ত দিয়া, হৃদয় দিয়া সেই কার্য্যকে উপযুক্ত ভাবানুপ্রাণিত করিবে। দুষ্টবুদ্ধি, আসুরী বুদ্ধি কালীর ইচ্ছাকে স্বীয় যুক্তিতর্কে যেরূপ বিকৃত করিয়া ফেলে—আসুরী চিত্তও সেইরূপ অশুদ্ধ আবেগে সেই ভগবৎ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। মায়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মা আর এইরূপ হইতে দেন না।

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছে যে মাতৃশক্তি আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে—আমাদের কামনা বাসনা, কল্পনা ভাবনা প্রভৃতি না থাকিলে তাঁহার কার্য্য পূর্ব্ববৎ বিকৃত ও দীর্ঘসূত্রীভাবে প্রকাশ না হইয়া, সুশৃঙ্খলে অবারিত দ্রুতবেগের সহিতই বিকশিত হইতে

থাকে। অন্যথা মানুষের অহংজ্ঞান এই ভগবদিচ্ছাকে বিকৃত করিয়া তোলে। আমাদের বিজ্ঞানময়কোষ হইতে ইচ্ছারূপিনী মাতৃশক্তি বুদ্ধি, মন, প্রভৃতির মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, যে যন্ত্রটির যে কার্য্য কেবল সেই কার্য্য করিলেই যোগী কালীর আদেশ লাভ করে—শুদ্ধ যোগীই এই-রূপ আদেশ লাভের অধিকারী, আর যাহারা অশুদ্ধ তাহারা অহঙ্কারের দ্বারাই কর্ম্মসৃষ্টি করে, পরন্তু মনে করে ইহাই বুঝি মায়ের আদেশ।

একণে, চিত্ত যে সকল সংস্কারে সমাচ্ছন্ন থাকে তাহাকে সেইগুলি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। চিত্তের আবেগ আসিলেই কার্য্য করিবে না—পরন্তু সেই আবেগ, সেই রস-ভোগ করিবে—কার্য্য করিবে, বিজ্ঞানে যখন পুরুষের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে; সেই ইচ্ছাই তখন যন্ত্রবৎ সমস্ত পরিচালন করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চিত্তের যে রসোচ্ছ্বাস তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে না—সে যে কালীর রসলীলা—উদ্দীপনা শুদ্ধ হইলেই তাহা উদ্বেলিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে আর বিচলিত করিবে না—অগাধ সমুদ্রে তরঙ্গহিল্লোলের মত কালীর সর্ব্ববিধ ইচ্ছার আবেগ-তরঙ্গও উঠিবে, পড়িবে, নৃত্য করিবে মাত্র। যখন দেখিবে চিত্তের এই উচ্ছ্বাস কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য চঞ্চল নয়, কোন তৃপ্তিবিধানের জন্য উদ্বেলিত নয়, কেবল ভগবদিচ্ছায়, প্রেমে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, পরদুঃখকাতরতায় নৃত্যশীল মাত্র, তখনই বুঝিবে হৃদয় শুদ্ধ হইয়াছে। যখন, পরোপকার বৃত্তি জাগরিত হইবে, তাহাকে একপ্রকার আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক কিছুতেই চালিত হইবে না—যতক্ষণ না ঐ বৃত্তি ব্যতীত একটা প্রত্যাদেশ উপর হইতে লাভ হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম এই সব অসম্ভব ও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু যন্ত্রগুলির অশুদ্ধতা বিদূরিত হইলেই দেখিবে, যন্ত্রাতিরিক্ত কোন গভীর প্রদেশ হইতে মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে।

৮

প্রাণের আধার এই শরীর। প্রাণ আছে বলিয়াই রক্তমাংসের এই দেহ বিদ্যমান। প্রাণশক্তির হ্রাস হইলেই বাহ্যাবয়বও জীর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রাণের শুদ্ধি হইলেই দেহ-শুদ্ধি আপনাআপনি হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য আত্মসমর্পণযোগীকে, এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইতে হইবে।

জীবের স্থূলদেহের সহিত সূক্ষ্মদেহের সংযোগ বিধান করিয়াছে এই প্রাণশক্তি, সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্ম প্রাণের খেলা, স্থূল শরীরে প্রাণবায়ু বিবিধ স্নায়ুময় কোষে অবস্থিত থাকিয়া জীবের গতিবিধি পরিচালন করিতেছে। এই স্থূল প্রাণের কথা পরে বলিব। এক্ষণে সূক্ষ্ম প্রাণের কথাই বলি।

সূক্ষ্ম প্রাণ, মন ও চিত্তের নিম্নে নাভিতলে অবস্থিত। হঠযোগে যে চক্রের উল্লেখ আছে—ইহাই সেই স্বাধিষ্ঠান চক্র। অনেকেই সূক্ষ্ম শরীরের এই চক্রগুলিকে স্থূল-শরীরে আবিষ্কার করিতে চান। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের গ্রন্থিগুলি ঠিক ঠিক ভাবে স্থূল শরীরে পাওয়া যায় না, হঠযোগীরা কয়েকটা অনুরূপ কেন্দ্র ধরিয়া সাধন আরম্ভ করেন এইমাত্র।

সূক্ষ্ম প্রাণ বুঝিতে হইলে গোড়ার কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। চতুষ্পাদ্ আত্মার যে তুরীয় অবস্থা—অর্থাৎ যে অবস্থা আনন্দময় সত্তারও বাহিরে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে—সেই পরম ব্রহ্মের বহির্বিকাশই এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ। এই অব্যক্ত অভাবনীয় তুরীয় ভাবই অধিরোহণ করিয়াছে প্রপঞ্চ জগদ্রূপে। এই অনির্ব্বচনীয় বিরাট ভাবই, আনন্দময় জ্ঞানময় সত্তাস্বরূপ, আত্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছে জীবের অন্তঃকরণকে—ইহাই হইতেছে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর। এই অন্তঃকরণের আবরণই আমাদের জাগ্রত বা পার্থিব শরীর। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নাই এবং জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম

নাই। সূক্ষ্মে ও স্থূলে সংযোগ হইয়াছে প্রাণময় সূত্র দিয়া—এই প্রাণ অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান্ জগৎ উপভোগ করিতেছেন।

বুদ্ধির অশুদ্ধতা যেমন জল্পনা কল্পনা, কূটতর্ক, একদেশদর্শিতা—মনের দোষ যেমন বিষয়ের দাসত্ব, বহির্জগতের তাড়নায় বিক্ষিপ্ততা—চিত্তের দোষ যেমন তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক সংস্কারপন্নতা, অতীত স্মৃতিকে সদা ধারণ করিয়া সঙ্কীর্ণ বৃত্তির অধীনতা—প্রাণের তেমনি প্রধান ও একমাত্র দোষ বাসনা। এই বাসনার কুহকে আচ্ছন্ন আছি বলিয়াই অতি অনিত্য ভোগ লালসায় উন্মত্ত হইয়া জগতের প্রকৃত ভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই।

মুকুর ধূলি সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে তাহাতে মূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। প্রাণও সেইরূপ বাসনাযুক্ত থাকায় ভোগে যে ব্রহ্মানন্দ তাহা উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য প্রথমেই প্রাণ হইতে বাসনাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে নিগ্রহনীতি অবলম্বন করিয়াই অনেকে এই কামনা ত্যাগের কল্পনা করে, কিন্তু আকাশে গৃহনির্ম্মাণরূপ অসাধ্য সাধনের মত তাহাদের প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। আজ যে সকল ব্যবধানের মধ্যে আপনাকে সংস্থিত রাখিয়া বাসনার হাত এড়াইলাম, পরজন্মে সেই সমস্ত অনুকূল অবস্থা না ঘটিলে বাসনার প্রবল প্রবাহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কে বলিতে পারে? এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি"।

বাসনা পরিত্যাগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আত্মপ্রকৃতির আমূল-পরিবর্ত্তনে। অন্তঃকরণকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাধকের জীবনে পুরাতনের কোন প্রভাবই যাহাতে কার্য্যকরী হইতে না পারে এমন ভাবে বুদ্ধি মন চিত্তকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল ভোগ্য বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া কামনার পরপারে চলিয়া যাইব—ইহাকে আমরা অস্থায়ী ও উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই বাসনা আমাদের কিরূপ বিভ্রান্ত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মৃত্যুর পরও জীবের মূলাধারে তাহার অতীত জন্মের সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়। নূতন জন্মগ্রহণের পরই একে একে জন্মার্জ্জিত বাসনাগুলি উঠিয়া জীবকে নাচাইতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণ—ভোগ ও কর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্র। এই ভোগ ও কর্ম্ম ভগবানের—কিন্তু ইহা উপর হইতে প্রাণে পৌছিবামাত্র আধারস্থিত বাসনার পুতিগন্ধে বিকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা চেষ্টারূপে, চিত্ত ও মনকে বাসনানুযায়ী বিষয়-গ্রহণের জন্য উন্মাদ করিয়া তোলে। বুদ্ধি বাসনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাম্য-পদার্থের প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মোট কথা এই, বাসনার প্রভাব বুদ্ধি হইতে স্থূলশরীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

বাসনার তিনটি রূপ। প্রথম আসক্তি, দ্বিতীয় কামনা এবং তৃতীয় রাগদ্বেষ। কোন বস্তুবিশেষের প্রতি যখন আসক্ত হওয়া যায় তখন মনে হয় ঐ বিষয় লাভ না হইলে মনুষ্য জন্ম বৃথা হইবে। সুতরাং ঐ বস্তু লাভ করিবার জন্য মন বুদ্ধি সমস্তই নিয়োগ করিয়া দিবারাত্র চেষ্টা করিতে হয়। অভীষ্টসিদ্ধ হইলে ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত, আর বিফল হইলে রাগে অভিমানে মৃতপ্রায় হইয়া কেবলই সেই চিন্তা, কেমন করিয়া হইবে—যে রকমেই হউক লাভ করা চাই। কোন প্রকারে প্রাণের এইরূপ আসক্তির উগ্রতা দূর হইয়া যাইলেও উক্ত দ্রব্যটি লাভ করিবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে থাকিয়া যায়। কখন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তৎক্ষণাৎ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়—ইহাই কামনার খেলা।

কামনা দূর হইয়া যাইলেও, রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। জন্মজন্মান্তরের বাঞ্ছিত জিনিষগুলিতে যেমন আনন্দ আছে, আবার যেগুলি ভাল লাগে না সেইগুলিতেও সেইরূপ উৎকট বিরাগ। এই রাগদ্বেষ তিরোহিত

হইলেই জীবের মধ্যে সমতা দেখা দেয়। ইহাই প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি।

একণে এই প্রাণকে কি করিয়া বাসনামুক্ত করা যায় ? সাধক কালী-শক্তিদ্বারা বুদ্ধিকে বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তুলিবে—বাসনা যেন বুদ্ধিকে কোন মতে বিভ্রান্ত করিয়া না তোলে। তাহার পর মনকে শান্ত ও চিত্ত যাহাতে অচঞ্চল থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে বাসনা কেবল প্রাণগত হইয়া পড়িবে—সেইখানেই সে উঠিবে পড়িবে পরন্তু মন ও বুদ্ধিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

এরূপ অবস্থায় অন্তঃকরণে পূর্ণ শান্তি সম্ভবে না, কেননা বাসনা প্রাণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তির জন্য ক্রমাগত চিত্তে মনে আঘাত করিতে থাকে, কিন্তু একবার যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযোগে এই সকল যন্ত্র হইতে বাসনার প্রভাব দূর করিয়া তাহাকে প্রাণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেননা চিত্ত ও বুদ্ধির সহায়তা না পাইলে বাসনা কার্য্যকরী হয় না। যদি এই বাসনা কোন ক্রমে জীবের অন্তরে একটা আদর্শ বা জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা হইলে তাহার শক্তি দমন করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য ভালমন্দ যে কোন বাসনাই হউক না কেন কখন বাসনার আবেগে অভিভূত হইবে না।

অনেকেই বলেন ভাল বাসনাগুলি রাখিয়া মন্দগুলি বিসর্জ্জন দিতে। এই সকল লোকের উপদেশসমূহে কখনই কর্ণপাত করিবে না। তবে এই-রূপ সঙ্কল্প করিতে পারা যায়, যে মন্দ বাসনাগুলিকে ত্যাগ করিবার জন্য উপস্থিত ভাল বাসনাগুলিকে রাখা হইতেছে, পরে মুমুক্ষুত্ব এবং ভগবানের সহিত মিলনের বাসনামাত্র রাখিয়া সেগুলিও ত্যাগ করা হইবে। পরিশেষে ভগবানের হস্তে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিলে হইবে নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার। নতুবা ভালর ছদ্মবেশে মন্দ বাসনা প্রাণের মধ্যে বাস করিয়া এমনে ভীষণ অবস্থায় নিক্ষেপ করে যে সেখান হইতে উঠিবার সামর্থ্য আর থাকে না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে পাপ পুণ্য উভয়েরই অতীত হইবার সঙ্কল্প।

বাসনা যখন প্রাণের সীমাবদ্ধ গতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া হাহাকার করিতে থাকে তখন তাহার করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবে না—সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবদ্ চিন্তায় মন ও বুদ্ধি সংযোগ করিবে। এই-রূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই দেখিবে আসক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে শক্তি নাই। আসক্তি শক্তিহীন হইলেই কামনা একেবারে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে—তখন অনায়াসেই আসক্তি ও কামনাকে চিরতরে দূর করিয়া দেওয়া যায়। আসক্তি এবং কামনার নাশ হইলেও রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কামনা না থাকায় জীবনের উপর যাহা আসে তাহা সুখ দুঃখ যুক্ত হইলেও সাধক নির্ব্বিকার চিত্তে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে—সুখে এবং দুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনাতেই ভগবানের হস্ত অনুভব করিতে করিতে সাধক সমতা ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী যে ভগবানেরই ভোগ ভূমি, এই শুদ্ধ ভোগের সহিত পূর্ণ শান্তি বিরাজমান—পূর্ণ সমতা লাভ করিলেই সাধক তাহার আস্বাদ পাইবে। অনেকের ধারণা, কামনা না থাকিলে ভোগ সম্ভবে না—ইহা নিতান্তই অজ্ঞতা—কামনার কুহকে প্রাণ আচ্ছন্ন থাকিলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না, আর জ্ঞান বিকাশ না হইলে ভোগের আস্বাদ করিবে কে? সত্যসত্যই কামনামুক্ত না হইলে ভোগ আরম্ভই হয় না। কামনার তাড়নায় যে ভোগ, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্লেশদায়ক, শঙ্কাবিজড়িত, সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রাণের যে ভোগ তাহা শান্ত, অফুরন্ত, পরমানন্দদায়ক। সেই "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"র মত, তৃপ্তি ও বৈরাগ্য বিবর্জ্জিত অমরার মহামৃত। ইহা হর্ষ বা সুখ নহে—ইহা আনন্দ—এই অমৃত পানে সাধক জন্মমরণ শূন্য হইয়া ভগবদ্ প্রকৃতি লাভ করে।

কাম যখন শুদ্ধ লিপ্সায় পরিণত হয় তখন সাধক জগতের যাবতীয় পদার্থই শিবের মত নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা ভগবানের দান বলিয়া সাধক সমস্তই আনন্দ রূপে গ্রহণ করে।

এই পূর্ণযোগীর আত্মা যদি অনন্ত নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানেও তাহার অবিচল পূর্ণ শান্তির অন্ত হয় না—ভক্তের মত কেবল ভগবানের ইচ্ছা বলিয়াই সে পরিতৃপ্ত হয় না—সে পরম জ্ঞানীর মত, নরক কুণ্ডকেও আলিঙ্গন করিয়া বলিতে থাকে, "ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার ভগবান্, আনন্দময় ব্রহ্ম—আমার শিবম্ শুভম্ সুন্দরম্।"

৯

এইবার আমি স্থূল শরীরের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সংযোগে প্রাণশক্তি এই রক্তমাংসের শরীর যদৃচ্ছা পরিচালন করিতেছে। এই অন্নময় শরীরের কেন্দ্রস্থান মূলাধার পদ্মে; ইহারই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নাভিতলের নিম্নে সূক্ষ্মপ্রাণ বিরাজ করিতেছে—স্থূল ও সূক্ষ্মের ইহাই মিলনকেন্দ্র। প্রাণবায়ুর বন্ধনে সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের সহিত আবদ্ধ, এই সূক্ষ্ম দেহ প্রাণবায়ু সংহৃত করিয়া প্রস্থান করিলে মানুষের মৃত্যু হয়—তখন অপান বায়ুমাত্র থাকিয়া জীবদেহের বিকৃতি উৎপাদন করে। একই বায়ু জীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য করে; প্রাণবায়ুর কার্য্য সূক্ষ্মদেহানুরূপ শরীর রক্ষা করা, তাই সূক্ষ্মদেহের অবর্ত্তমানে শরীরের শৃঙ্খলা থাকে না—অনন্ত কোটী জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া দেহ রূপান্তরিত হয়। আমি এ পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের শুদ্ধি বিধানের কথাই বলিয়া আসিয়াছি—মানুষের সূক্ষ্মদেহ কি? তাঁহার অন্তঃকরণ—এই অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলাই এই যোগের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। শরীর কিছুই নহে,

সূক্ষ্মদেহেরই ছাঁচ বিশেষ, মনই এই শরীরকে গড়িয়া তোলে, মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মন যদি মুক্ত ও শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই শরীরও শুদ্ধ এবং মুক্ত হইয়া উঠে, মানসিক অশুদ্ধতা নিবন্ধনই আমরা শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু প্রভৃতি ভীষণ দ্বন্দ্ব ভোগ করি। সাধন সাহায্যে আমাদের মন যখন অতীত সংস্কার হইতে মুক্ত হয়, মায়ার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলে, তখন জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মভোগ সবেগে শরীরের উপর পতিত হয়। সাধক তখন ইচ্ছা করিয়াই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই কর্ম্মফল শরীর দিয়া ভোগ করিতে থাকে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দৈবিক, ভৌতিক যতবিধ নির্য্যাতন থাকিতে পারে সমস্তই শরীরের উপর ভোগ হইতে থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধকের মন ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আবার নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে মনের সর্ব্ববিধ অশুদ্ধতা শরীরের উপর ন্যস্ত হইলে, সাধক সেই অন্নময় কোষ হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারে, এরূপ অবস্থায় সাধক কায়া শুদ্ধি ও কায়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে—হঠযোগ ও রাজযোগীদের প্রণালীই এ ক্ষেত্রে অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু আমরা যে আত্মসমর্পণ যোগের কথা বলিতেছি, তাহা উক্ত প্রকার সাধন প্রণালী অপেক্ষা সরল ও সহজসাধ্য এবং নিশ্চয়ই সিদ্ধিপ্রদ। যদি তুমি মনকে শুদ্ধ করিতে পার, স্বভাবতই তোমার শরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; যাহার মন পৃথিবীর পাপ হইতে মুক্ত, স্বাধীন তাহার শরীরও অসাধারণ শক্তি-সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃকরণের ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে, নিশ্চয়ই তোমার শরীর উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান কালে শরীরের উপর অযথা অত্যাচার করিবে না—মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে শরীরের সকল দোষ বিদূরিত হয় না—শরীর

যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যেন শরীরের সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই—যতটা পার, ইহা শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শক্তির হস্তে যন্ত্র-স্বরূপ এইরূপ ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। অধিকাংশ সাধক এই অব-স্থায় শরীরের চিন্তায় আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, কিন্তু তাহা উচিত নয়—ভগ-বানের হস্তে এ শরীর দিয়াছ এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হইবে, যত উৎকট ব্যাধিই হউক না কেন, বিন্দুমাত্র ভীত হইও না—তাহা যে শরীরের অশু-দ্ধতা, এবং এই অশুদ্ধি বহিষ্কৃত হইয়া গেলে শুদ্ধি আসিবে এইরূপ মনে করিবে। কেননা, বহু কুসংস্কারপূর্ণ জীর্ণ আধার যন্ত্রটিকে ভগবানের কার্য্যোপযোগী করিতে তাহার বহু পরিবর্ত্তন আবশ্যক—সমগ্র নাড়ীযন্ত্র, মস্তিষ্ককোষ, পরিপাকরস-নিঃস্রবণকারী যন্ত্রগুলির আমূল পরিবর্ত্তন আব-শ্যক—এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য নানাবিধ শারীরিক অসুবিধা কিছু কিছু ভোগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির জানিও। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতার সময় যদি একান্তই অধীর হইয়া পড় এবং ইহার প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া যদি নিতান্তই ঔষধাদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে যতটা পার খুব সামান্য নির্দ্দোষ ঔষধাদি সেবন করিবে। ব্যাধি দূর করিতে গিয়া উগ্রভাবে শরী-রের উপর নূতন অত্যাচার করিও না—মনে রাখিও, "You cannot care more for yourself, than God cares for you"—ভগবান্ তোমার জন্য যেরূপ যত্ন লন তুমি কদাচ নিজের জন্য সেরূপ লইতে পার না। তোমার চেষ্টা তোমায় বিপথেই পরিচালিত করিবে—ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি মঙ্গল এবং শুভের পথেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন—সাধকের এইটুকু আস্থা না থাকিলে তাহার পক্ষে যোগসাধনা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

শরীরের দোষ ও গুণ সবিশেষ জানিতে হইলে হঠযোগ কথিত শরীরতত্ত্ব

বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই; তবে মোটামুটি শরীরের অশুদ্ধতা জরা, শীতোষ্ণে সুখ দুঃখ বোধ, মলমূত্র প্রভৃতি আবেগের অধীনতা। একটি পদ্মপত্রে যেমন অসংখ্য শিরা সুবিন্যস্ত, সেইরূপ আমাদের শরীর গণনাতীত সূক্ষ্ম স্থূল শিরা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ঈড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান এবং প্রাণ, অপান প্রভৃতি দশবিধ বায়ু এই নাড়ীসমূহে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া আমাদের বাহ্যাবয়বকে সঞ্চালিত করিতেছে। যেমন একই ব্রহ্ম নিখিল ভুবনে বহু বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভব করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুর অহংপরবশ হেতু পরস্পর হইতে ভিন্নবোধ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেইরূপ একই বায়ু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সংসাধনে রত থাকিয়া তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। হঠযোগদ্বারা সমগ্র বায়ুর কার্য্য একই প্রাণবায়ুর সাহায্যে সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণের ইচ্ছামত সমস্ত শরীর যন্ত্রটীকে পরিচালিত করা অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই অবস্থায় শরীরের শুদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে, সাধক ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার ব্যাধির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে—শীতোষ্ণে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্বভোগ করিতে হয় না—মলমূত্র ত্যাগের আর আবশ্যক হয় না, এমন কি কেবল বায়ু আহার করিয়াই অতি দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইচ্ছামাত্র সাধক আপনার শরীরকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিতে পারে, আবার সূচের মত সূক্ষ্মশরীরও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, লৌহের মত গুরু এবং তুলার মত লঘু হইয়া আকাশে পরিভ্রমণও করিতে পারে, ইহাই অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। কলিযুগে এরূপ অবস্থা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তবে ইহা একান্তই অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবারও কোন কারণ নাই।

আমরা যে যোগ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত উপরে কথিত হঠযোগের কোনই সম্পর্ক নাই, আমরা অন্তঃকরণকেই সর্ব্বপ্রথমে

বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই, পাশ্চাত্য জাতিগণের মতে শরীরের স্বচ্ছন্দতাই মানসিক উন্নতির একমাত্র কারণ আমরা ইহা স্বীকার করি না। শরীরের অনুগত মন, এই ধারণা মানুষের মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া দিতে হইবে—আমরা শুদ্ধ মনের দ্বারাই দেবশরীর গঠন করিয়া তুলিতে চাই। মনই শরীরকে চালিত করিবে, শরীরের অবস্থান্তর মনের দ্বারাই ঘটিয়া উঠিবে, এমন কি জগতের যে নিয়ম মৃত্যু তাহাও যোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে তাই যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু। সেইজন্য সাধকের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা কেন্দ্রগত হইবে অন্তঃকরণের উপর—এই অন্তঃকরণের পূর্ণ বিকাশের উপরেই বহির্জগতের উন্নতি-নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে মানুষ হইতেছে বুদ্ধিজীবি, চিত্ত মন প্রাণ শরীর এই সমস্ত বুদ্ধিরই অধীন এবং বুদ্ধিদ্বারাই ইহাদের উন্নতি অবনতি ঘটিতেছে। এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের নূতন যোগ প্রচার করিতে চাই। বুদ্ধির স্বভাবতঃ নিম্নগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাহার সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতে চাই কালীশক্তিকে বুঝিবার জন্য, তারপর এই কালীশক্তির করুণা-বলেই বুদ্ধির মুখের তীব্র উজ্জ্বল আবরণটিকে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিতে চাই এবং তাহারই আলোকে বুঝিতে চাই—আমরা কে? যখন আমরা অনন্ত কালীশক্তির যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহি এইরূপ বুঝিব তখন অন্ধের মৃত্যুর বোঝা কালের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া মুক্ত পুরুষের মত বলিয়া উঠিব—আমরা মুক্ত, আমরা শুদ্ধ, আমরা সিদ্ধ।

পূর্ণ-যোগ

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—শ্রীরামেশ্বর দে
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস
বোড়াইচণ্ডিতলা
চন্দননগর

Imprimerie Sadhana
CHANDERNAGOR
INDE FRANCAISE.

বিজ্ঞাপন

পূর্ণযোগ প্রবর্ত্তকে বাহির হইয়াছিল—একটু আধটু সংশোধন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। পূর্ণযোগ কিন্তু অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। **Original idea** ছিল তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ করা। প্রথম ভাগ শুধু শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পূর্ণযোগের যে মূল কথা 'বিজ্ঞান', সেই সম্বন্ধে লিখিবার এবং তৃতীয় ভাগে পূর্ণযোগের সাধনা অর্থাৎ **Practical indications** দিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থকার

২০এ ভাদ্র, ১৩২৫

পূর্ণ-যোগ

১

যোগের উদ্দেশ্য

মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। এখানে ভগবান্ অর্থে আমরা যাহাই বুঝি না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। মানুষ হইতে উচ্চতর বৃহত্তর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। ভক্তের সহিত ভগবানের, অহংএর সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার—এমন কি বৌদ্ধমত অনুসরণ করিয়া সংস্কারের সহিত শূন্যের—আমরা সেই একই সংযোগের কথা বলিতে পারি। মূল কথা এই সংযোগ,

এই সম্বন্ধ স্থাপন, উহা হইতেই যোগসাধন আরম্ভ। কিন্তু এই সাধনার প্রণালী, গতি, পরিণতি সব নির্ভর করে মানুষ আপনার কোন্ ভাগে কোন্ ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বা হইতে চাহিতেছে, তাহার কোন্ অঙ্গে ভগবানের স্পর্শ পড়িয়াছে।

কারণ মানুষ বিশুদ্ধ অমিশ্র অখণ্ড একটি বস্তু নয়। সে বিভিন্ন ও বিপরীত গুণাবলীর সমষ্টি, প্রকৃতির সকল স্তর তাহার মধ্যে গ্রথিত, সৃষ্টির সকল স্রোতই তাহার মধ্যে বহমান। আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি প্রধানতঃ তিনটি স্তর একটির উপরে আর একটি সেখানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথম দেহ আর দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে যে জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি। দ্বিতীয় মন—বুদ্ধি বিচার চিন্তা ভাবুকতা প্রভৃতির খেলা এই উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে। তৃতীয় ও উর্দ্ধতম ক্ষেত্র হইতেছে অধ্যাত্মবোধ যাহার স্বরূপ বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—যাহা অমৃতত্বের অধিষ্ঠান। বর্ত্তমানে মানবপ্রকৃতি এখনও এই আত্মাকে সজ্ঞানে চিনিতে পারে নাই; সে তাহার মনের খেলার মধ্য দিয়াই আভাসে ইঙ্গিতে ইহাকে বোধ করিতেছে। কিন্তু উহাই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। দেহ ও প্রাণ লইয়া মানুষের পশুভাব, মন বুদ্ধি লইয়া মানুষের মানুষভাব আর তুরীয় জ্ঞান আনন্দ লইয়া মানুষের দেবভাব, সিদ্ধভাব বা ভাগবতভাব। বিবর্ত্তনের গতি চলিয়াছে পশুভাব হইতে মানুষভাবে, মানুষভাব হইতে দেবভাবে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি চায় মানুষকে পশুভাব মানুষ-

ভাব হইতে দেবভাবে তুলিয়া ধরিতে তাহারই নাম যোগশক্তি, এবং সেজন্য যে পথে চলিতে হয়, জীবনকে গড়িতে হয় চালাইতে হয় তাহারই নাম যোগসাধনা।

ভারতবর্ষে যে নানা সাধনপন্থা প্রচলিত আছে তাহাও মানুষের এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে স্তরে স্তরেই সজ্জিত। প্রথম হঠযোগ। হঠযোগের ক্ষেত্র মানুষের সর্ব্বনিম্ন স্তর—তাহার স্থূল-দেহ। শরীর ও প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উহার মধ্যেই ভগবানের স্পর্শ অনুভব করা হঠযোগের উদ্দেশ্য। তারপর রাজযোগ মানুষের দ্বিতীয় স্তরের উপর স্থাপিত। সমস্ত মনটি, মনের কোন বিশেষ বৃত্তি বা খেলা নয় কিন্তু মনের যে মূলপ্রকৃতি সেই মানস-সত্তা অথবা চিত্ত দ্বারাই রাজযোগ মানুষকে সাধনমার্গে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিতেছে। রাজযোগ কেন্দ্রীভূত মানুষের সূক্ষ্মদেহে। সর্ব্বশেষে মানুষের আধ্যাত্মিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মার্গত্রয় —(১) জ্ঞানযোগ (২) ভক্তিযোগ (৩) কর্ম্মযোগ। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মপ্রেরণা (ইচ্ছাশক্তি will) মনের এই তিনটি প্রকরণ। জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই তিনটির একটির উপর নির্ভর করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে ভাগবতসত্তায় পরিণত করিতে চায়। মার্গত্রয়ীর কেন্দ্র মানুষের স্থূল দেহও নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়, তাহা হইতেছে আত্মা, জীব বা পুরুষ। জ্ঞান প্রেম অথবা শক্তির মধ্য দিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার, জীবের সহিত ভগবানের, পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনই ত্রিমার্গের অধ্যাত্মযোগ।

এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থার সার্থকতা কি, অভাব কি, গুণ কি, দোষই বা কি তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন সাধনার উদ্দেশ্য কি, যোগের লক্ষ্য কি? কারণ একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারাই উপায়ের সফলতা বা নিষ্ফলতা বিচার সম্ভব। কোন্ সাধনমার্গের উপযোগিতা কোথায়, অনুপযোগিতা কোথায় তাহা স্থির করিতে হইবে কি লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধনা করিতে চলিয়াছি। যোগসাধনার দুইটি লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে —কৈবল্যমুক্তি আর জীবন্মুক্তি। মায়াবাদীগণের মত জগৎকে যদি শুধু মরীচিকা শুধু দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানি, বৌদ্ধদিগের মত মানুষকে, সৃষ্টিকে যদি 'ক্ষণিক বেদনা'-সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করি তবে জগতে থাকিতে আমরা চাহিব না—কোনরূপে এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই আমাদের নিঃশ্রেয়স, দীপশিখার মত কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ। জীবনকে মুছিয়া দিয়া, জগতের সহিত সকল সম্পর্ক শূন্য হইয়া উহাদের অতীতে কোন কিছুতে অথবা কিছু-না'র মধ্যে মিশিয়া মিলাইয়া যাওয়াই কৈবল্যমুক্তি। ইহাই যদি আমাদের সাধনার লক্ষ্য হয় তবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা তাহাদের পরস্পরের তুলনা বা দোষগুণ বিচার করা উহাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে পন্থাই নির্ব্বাচন কর না কেন, একবার নির্ব্বাচিত করিয়া সেই পন্থা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপরে উঠিয়া যাওয়াই যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন উপায় রজ্জু হউক, বংশদণ্ড হউক অথবা প্রস্তরের সোপান হউক তাহাতে

কি আসে যায়—কোন প্রকারে পার হইতে পারিলেই ত সব হইল। তবে একথা সত্য, ভিন্ন স্বভাব ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোন পন্থা কাহারও কাছে সুগম কাহারও কাছে দুর্গম। কিন্তু এইটুকু বিচার করা সাধকের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নয়।

কিন্তু জগতের অর্থ যদি আমাদের কাছে অন্যরূপ বোধ হয়, জগৎ মোহ বা দুঃস্বপ্ন নয়, জগৎ আনন্দময়, জগৎকেই যদি আমরা নিঃশ্রেয়সের আধার বলিয়া জানি, জীবনকে অস্বীকার করিয়া নয়, জীবনকে আলিঙ্গন করিয়াই যদি আমরা মুক্ত সিদ্ধ হইতে চাই তবে যোগসাধনার এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। মানুষরূপ যে মন্দির তাহার দেবতা মন্দিরের চূড়ায় যে কেবল অধিষ্ঠিত তাহা নয়, এই মন্দির যে সেই চূড়ায় উঠিবার জন্য শুধু সোপানাবলীর সমষ্টি তাহা নয়। ইহার মধ্যে যতগুলি প্রকোষ্ঠ আছে সবগুলিই দেবতার প্রতিষ্ঠান, দেবতার নিবাসধাম —সকলগুলি যুগপৎ পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত রাখিতে হইবে, সকলগুলির মধ্যেই যুগপৎ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। শরীরের অতীত হইবার জন্যই শুধু শরীর নয়, মনের অতীত হইবার জন্যই শুধু মন নয়, জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের অতীত হইবার জন্যই শুধু জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম নয়, ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিবার জন্যই শুধু ব্যক্তিত্ব নয়। দেহ মন আর অধ্যাত্ম বৃত্তি ভগবানকে পাইবার যে কেবল পন্থা বা উপায়মাত্র তাহা নহে। আমরা যখন বুঝিতে পারি শরীরের পশ্চাতে কেবল যে ভগবান্ তাহা নহে শরীরই ভগবান্, মনের পশ্চাতে শুধু নহে মনই ভগবান্, অধ্যাত্মসত্তার পশ্চাতে শুধু

নহে অধ্যাত্মসত্তাই ভগবান্ তখন সকল প্রকার সাধনপন্থারই এক-যোগে আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি। শরীর মন আত্মা এই তিনটি স্তরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিব, মানুষের সমগ্রটির মধ্যে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিব, আমাদের কোন একটিমাত্র অঙ্গে নয়, আমাদের যাহা কিছু আছে সকল অঙ্গদ্বারাই ভগবানকে আলিঙ্গন করিব—ইহাই যদি আমাদের যোগের লক্ষ্য তবে শুধু একটি কোন বিশেষ পন্থাই আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা চাই অখণ্ড পূর্ণযোগ যাহা দ্বারা আমাদের সকল স্রোতধারায় ভগবান্ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে পারেন, আমাদের সকল ক্ষেত্রকেই ফলে ফুলে ফসলে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতে পারেন। আরও, আমরা শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধি চাহি না, আমরা চাহি বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি। বিশ্বমানব যাহাতে শুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা তাহারই প্রতিকৃতি। মানবসঙ্ঘের নির্ব্বাণ আমরা চাহি না, আমরা চাহি যাহাতে সে তাহার অশেষ বৈচিত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহার বর্ত্তমান সকল প্রেরণা সকল প্রয়াস সকল কর্ম্মই থাকিবে শুধু তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে একটা উচ্চতর কিছুর মধ্যে—ভগবানের মধ্যে। ইহা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন কোন একটি মাত্র বিশেষ সাধনমন্ত্র কিছু সমগ্র মানবজাতির ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার উপর চাপাইতে পারি না। তাই আমাদের সকল পন্থার সমন্বয় বাহির করা প্রয়োজন, এমন সমন্বয় যাহা শুধু আমাদের নিজের নিজের নয় কিন্তু নিখিল জীবের মানবজাতির সমষ্টিগত সাধনার পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

এই পূর্ণাঙ্গ যোগই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রাখিয়া, উহার সাহায্যেই স্থির করিতে হইবে কোন্ যোগ-পন্থার কতটুকু সার্থকতা, কতটুকুই বা ত্রুটি। তাহার পূর্ব্বে এই বিভিন্ন পন্থার কিছু ব্যাখ্যা, কাহার কি বিশেষ ফল তাহা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

২

হঠযোগ

প্রকৃতির প্রতিষ্ঠাভূমি যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, সহজ ভাষায় যাহার নাম দেহ ও প্রাণ, তাহাকে পরিশুদ্ধ বশীভূত করাই হঠ-যোগের লক্ষ্য। সাধারণ জীবনে মানুষের দেহ ও প্রাণ গঠিত হই-য়াছে সেই সাধারণ জীবনের প্রয়োজন হিসাবে। প্রকৃতির বিরাট ভাণ্ডার হইতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের এই দেহ ও প্রাণ। বংশানুক্রমের ধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধারা এই দুইটির দ্বারা আমাদের শরীর ও প্রাণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত খণ্ডিত। শরীর সেই সেই অঙ্গ ততটুকুমাত্র সঞ্চালন করে, প্রাণে শুধু সেই পরিমাণে শক্তির খেলা হয় যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন ও পর্য্যাপ্ত, তাহার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতি সাধারণ মানুষের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে হঠযোগ তাহা অতিক্রম করিয়া আর একটি বৃহত্তর ধর্ম্ম আর একটি পূর্ণতর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়।

শরীর শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা রোগ জরা মৃত্যুর দাস, তাহার চির অভ্যাসগত কর্ম্মগুলিরই মধ্যে সে আবদ্ধ, প্রাণে ততটুকু বেগ যত-টুকুর জোরে শরীর তাহার আয়ুর বর্ষ শতেকের পারে যাইয়া পৌছিতে পারে। হঠযোগী চায় প্রাণের মধ্যে এমন একটি উৎস খুলিয়া দিতে যাহার সাহায্যে প্রকৃতির অজস্র অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাহার ভিতরে বিপুল স্রোতে বহিয়া আসিতে পারে, শরীরের সকল ক্ষুদ্র বন্ধন, যাবতীয় খণ্ডিত সংস্কার ভাসিয়া যাইতে পারে। শরীর ও প্রাণকে সাধারণ জীবনের প্রয়োজনের শুধু উপযুক্ত করি-য়াই রাখিতে চায় না। শরীর সুস্থভাবে অনিশ্চিত কাল ব্যাপিয়া থাকিবে, প্রকৃতির অনন্ত জীবনী-শক্তি ধারণ করিবার সামর্থ্য উহাতে থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী দুইটি উপায় লইয়াছে— আসন ও প্রাণায়াম। আসনের দ্বারা শরীরকে অচঞ্চল স্থির হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শরীর নিতান্ত অস্থির, একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ প্রকৃতির প্রাণ-শক্তির বিরাট সমুদ্র হইতে যে স্রোত শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা আসিয়া পড়িতেছে শরীর তাহার সব কিছু ধারণ করিতে পারে না, তাই বিবিধ অঙ্গসঞ্চালনীর মধ্য দিয়া উহা বাহিরে উপছিয়া পড়ে, নানা কর্ম্মাবলী দ্বারা অতিরিক্ত শক্তিটুকু ক্ষয় করিতে আমরা বাধ্য হই। শরীরকে শান্ত নিস্পন্দ করা অর্থ এই প্রাণশক্তি সবটুকু নিজের মধ্য ধারণ করা। প্রাণশক্তি যদি এইরূপ শরীরের মধ্যে জমাইয়া তুলিতে পারি তাহার ফলে শরীর বলীয়ান, স্বাস্থ্যপূর্ণ কমনীয়

হইয়া উঠে। হঠযোগী তারপর নানা প্রকার জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে সকল ময়লা দূর করেন ও নাড়ীমণ্ডলী পরিশুদ্ধ রাখেন। নাড়ী শুদ্ধির উদ্দেশ্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবাধ খেলা। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া যে প্রক্রিয়া তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণশক্তিকে, প্রাণবায়ুকে সংযত স্ববশীভূত করা। আর নিশ্বাস প্রশ্বাসই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রধান স্থূল ক্রিয়া। প্রাণায়ামের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম আসনের দ্বারা যে কায়াসিদ্ধি হয় তাহাকে আরও পূর্ণতর করা। প্রাণায়ামের ফলে শরীরে প্রাণশক্তি মুক্তভাবে খেলিতে পারে ও সে শক্তির বেগও অনেক বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ শরীর যে সকল নিয়মের দাস সে সকল সে অতিক্রম করিতে পারে। প্রাণশক্তিকে স্ববশে আনিয়া শরীরের দ্বারা যে নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করা যাইতে পারে—ইহা হঠযোগশাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরদিন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শরীর স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং হঠযোগীরা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বহুকাল এমন কি অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। প্রাণায়ামের আর এক ফল উহা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সাধারণ মানুষের অলভ্য অপরিচিত নানা প্রকার নূতন বৃত্তি খুলিয়া দেয়—সাধকের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় সৃষ্টির অদৃশ্য স্তর, অকল্পিত জগৎ, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত শক্তি। শুধু তাহাই নয় মানুষের যে সকল সাধারণ বৃত্তি উহাদেরও পরিস্ফুরণ হয়, উহারাও বিপুল শক্তির আধার হইয়া কার্য্যকরী হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী আরও নানা

প্রকার গৌণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন।

হঠযোগের ফল যাহা তাহা আমরা দেখিলাম। সাধারণ মানুষ এই সকলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই এ সকলের সার্থকতা কি? শরীর না হয় অক্ষয় হইল, অসাধারণ শক্তির আধার হইল কিন্তু মানুষ কেবল ঐটুকুতেই তৃপ্ত হইতে পারে কি? মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত কথায়, শুধু বিত্ত আহরণ করিয়া লাভ কি—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

হঠযোগের এইখানেই মস্ত অভাব। ভগবানকে, অমৃতকে সে অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। যোগের যে মুখ্য কথা ভগবানের মধ্যে মুক্ত সিদ্ধ হওয়া হঠযোগী সেটুকু মনে রাখিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের মোহে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই জন্যই সচরাচর প্রকৃত যোগীদিগের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি, 'সিদ্ধাই'র প্রতি কেমন একটা সঙ্কোচ, অথবা ভীতি রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন এ সকল ভূত প্রেতের খেলা অথবা পথের প্রলোভন —এ সকল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সাধকের মধ্যে এইরূপ কোন ঐশ্বর্য্যের সঞ্চার হইলে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। কিন্তু ইহাও আবার অতি মাত্রা। আমরা ঐশ্বর্য্যও চাহি কিন্তু তাহা হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ভগবৎ উপলব্ধি ও ঐশ্বর্য্য যে যুগপৎ থাকিতে পারে না তাহা নয়। হঠযোগীর ভুল এইখানে তিনি যে শক্তির অধিকারী ভগবানকে বিস্মরণ করিয়া তাহা কৃপণের মত নিজের জন্য নিজের মধ্যে লুকা-

ইয়া রাখেন। আমরা যে পূর্ণযোগের কথা বলিয়াছি তাহা জগৎ লইয়া মনুষ্যজাতি লইয়া। আমাদের যোগের ফল বিশ্ববাসীর কল্যাণে জগতের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে। অন্যান্য যোগীদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্য আমরা বর্জ্জন করিতে চাহি না কিন্তু হঠযোগীর মতনও আবার উহাকেই একান্ত করিয়া ধরিব না। তারপর আমাদের যোগের লক্ষ্য জগতের সহিত সকল প্রকার জাগ্রত সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু হঠযোগী যে বিরাট জটিল প্রক্রিয়াদিতে মগ্ন তাহা তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময়কে নিয়োজিত রাখে—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়। অধিকন্তু হঠযোগী ভীষণ কৃচ্ছ্র সাধনার পর যে সকল ফলের অধিকারী হয়েন তাহা যে কেবল হঠযোগের দ্বারাই লভ্য এমন নহে। রাজযোগের দ্বারা তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সেই সকল ফল অনেক সহজে আমরা পাইতে পারি। হঠযোগের দান অনেকখানি সন্দেহ নাই কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ মূল্য সে আদায় করে তাহা নিতান্তই বিসদৃশ। সেই একই মূল্য দিয়া আমরা সেই সমস্ত জিনিষ ও আরও মহত্তর জিনিষ সব পাইতে পারি।

৩

রাজযোগ

হঠযোগের একস্তর উপরে হইতেছে রাজযোগ। আমরা বলিয়াছি এই রাজযোগ শরীর বা প্রাণ লইয়া নয়, ইহার কেন্দ্র মন। মনকে

বশীভূত করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে পরিবর্ত্তিত, ভাগবত সত্তায় অধিষ্ঠিত করিতে সে চাহে। মনকে শুদ্ধ, সংযত, শান্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানসিক রাজ্য—আমাদের সকল চিন্তা ভাব, বাসনা, প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এখন মনের যে বিচিত্র খেলা, যে বহুমুখী বৃত্তি সে সকলের উৎস হইতেছে চিত্ত। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা বোধ করি তৎ সমস্তই উঠিতেছে চিত্ত-সাগর হইতে, উহার মধ্যেই বিলীন হইতেছে, উহার মধ্যেই সংস্কাররূপে থাকিয়া যাইতেছে। মনের যে প্রতিষ্ঠা, যে মূল সেই চিত্তেরই উপর রাজযোগের দৃষ্টি। চিত্তকে যদি একবার বশ করা যায় তবে সমস্ত মন আপনা হইতেই বশে আসিবে। তাই পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রথম সূত্র যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদা শতধা চলমান। বৃত্তি সকলের উদ্দাম বিক্ষোভে মানুষের অন্তর আবিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাই আপনাকে সে জানিতে পারে না, আপনার মধ্যে যে বৃহত্তর মহত্তর সত্তা সেই ভগবান্ সেই পরমপুরুষের স্পর্শ পায় না। ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল ইহাকে স্থানচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে—ভৃত্য প্রভুর আসনে বসিয়া রাজ্য চালাইতেছে। এই চিত্তবৃত্তিকে আনত শান্ত করিবার জন্য রাজযোগী অষ্টাঙ্গ সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গ হইতেছে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। প্রথম যম ও নিয়ম। মনের চিত্তের যে অতিমাত্র চাঞ্চল্য, প্রবৃত্তির যে উচ্ছৃঙ্খল বেগ তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে

খর্ব্ব করিয়া আনা যম ও নিয়মের লক্ষ্য। অহিংসা, সত্যভাষণ, মিতাচার, শুচি, সন্তুষ্টি, ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া সাধক চিত্তবিক্ষোভের দাসত্ব হইতে অনেকখানি মুক্তিলাভ করেন। মনকে সংযত নিয়মগত করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির শান্ত হইতে শিক্ষা দেন। কিন্তু মনকে শান্ত করা কেবল মনের দ্বারাই হয় না। মনের উপর শরীর এবং প্রাণেরও অনেকখানি আধিপত্য রহিয়াছে। রাজযোগ তাই আসন এবং প্রাণায়ামেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে হঠযোগী যে কৃচ্ছ্রসাধ্য শতাধিক আসন, যে বহুবিধ জটিল প্রাণায়াম ক্রিয়ার সাহায্য লইয়াছেন, রাজযোগী সে সকলকে সহজ সরল করিয়া যতটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করিয়াছেন। স্থিরসুখ আসনই একমাত্র আসন অর্থাৎ যেরূপে বসিলে মন স্থির করিবার সুবিধা হয়, প্রাণায়াম সহজ হয় তাহাই আসন। প্রাণায়াম হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। এই শ্বাস প্রশ্বাস রোধের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম শ্বাস প্রশ্বাস রোধের সহিত চিত্তবৃত্তির রোধও সহজ হইয়া আইসে। দ্বিতীয় শ্বাস প্রশ্বাসের খেলাকে স্ববশীভূত করা অর্থ প্রাণবায়ুকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখা, তাহাকে অধিগত করা। ইহাতে প্রাণশক্তির আধার যে সুপ্ত কুণ্ডলিনী তাহা জাগরিত হয়, চিত্তের উপর যে তমঃ যে ঘন আবরণ পড়িয়া আছে তাহা দূরীকৃত হয়, চিত্ত স্বচ্ছ সত্ত্বপ্রকাশক হইয়া উঠে। চিত্তকে সত্ত্বপূর্ণ প্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে ইহা আসন ও প্রাণায়ামের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের অতিরিক্ত বা অবান্তর যে প্রক্রিয়াদি রাজযোগ সে সকল পরিত্যাগ

করিয়াছেন। আরও, প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক যে সকল ঐশ্বর্য্য, যে সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে রাজযোগী হঠযোগীর ন্যায় তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট বা আসক্ত নহেন।

চিত্ত যখন বিমল শান্ত হইয়াছে, প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন তাহাকে একেবারে চিন্তাশূন্য, একেবারে নিশ্চল করিবার জন্য প্রাণায়ামের পরে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করিয়া একটি মাত্র প্রতীতি বা জ্ঞানের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের মধ্য দিয়া সর্ব্বশেষে সেই 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূণ্যমিব সমাধি'র মধ্যে পৌঁছিতে পারিলেই রাজযোগের সিদ্ধি। এই সমাধি অবস্থায় বহিঃকরণ অন্তঃকরণ সব নিশ্চেষ্ট, সব শান্ত, এখানেই সকল আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এখানে তুমি আমি ধ্যান ধ্যেয় কিছুই নাই, আছে কেবল এক উদার মহৎ বিরাট স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্য। এই সমাধি অবস্থা যখন এরূপ পূর্ণ ও সিদ্ধ হয়, যখন চিত্তের সংস্কার সমুদয় শুধু শান্ত নয় কিন্তু একেবারে সমূলে উৎপাটিত লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই 'দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্'।

রাজযোগ হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি শিক্ষা পাই। প্রথম, সাধারণতঃ আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া স্থূলের মধ্যেই থাকি, ইন্দ্রিয়াতিগ ভূমির কোনই সংবাদ রাখি না। রাজযোগ দেখাইয়া দেয় ইন্দ্রিয়ের খেলাকে দমন করিলে, মনকে নিস্তব্ধ চিন্তাশূন্য করিলে আমরা আর এক প্রকার চৈতন্যের মধ্যে জাগরিত হই। ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতীতির মধ্যেই আমাদের জ্ঞান আর বদ্ধ থাকে না,

জ্ঞানের নূতনতর গভীরতর উৎস খুলিয়া যায়। আর তাহাই সত্য অব্যর্থ জ্ঞান। বস্তুর অন্তরের সত্তা তখন আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়, তখনই জীব আপনার আধ্যাত্মিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম স্বরাজ্য সিদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ শুধু অন্তর্জগৎকে বশীভূত করা নয়, শুধু আত্মচৈতন্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নয় কিন্তু সমাধি অবস্থার সে কেন্দ্রীভূত বিপুল চিৎশক্তি দ্বারা আমরা বহির্জগৎকেও বশীভূত করিতে পারি, তাহার দ্বারাই আমাদের স্বভাব আমাদের কর্ম্মজীবন আমাদের পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত, গঠিত, পরিচালিত করিতে পারি। ইহাকেই বলা হইয়াছে সাম্রাজ্য সিদ্ধি। ইদানীন্তন কালে এই সাম্রাজ্য সিদ্ধির কথা রাজযোগী তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না, ইহাকে একরকম রাজযোগ সাধনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। প্রাচীন কালের সাধকগণ কিন্তু সাম্রাজ্যসিদ্ধি ব্যতিরেকে স্বরাজ্যসিদ্ধিকে কোন দিনই পূর্ণ, সার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

শরীর ও প্রাণের উপরে উঠাইয়া রাজযোগ মানুষকে পরিপূর্ণ করে তাহার মানসিকক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, মানুষকে দেয় প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের আস্বাদন। ইহাই রাজযোগের দান। কিন্তু রাজযোগের অভাব এইখানে যে শুধু সমাধি অবস্থাটিকেই সে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। আমরা চাহি অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রের চেতনাকে স্থূলের মধ্যে জাগরিত করিতে, জগৎকে আত্মার শক্তির দ্বারাই রচিয়া তুলিতে। রাজযোগী কিন্তু স্থূলের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়া, প্রাণের মনের সকল রকম খেলাকেই

নিস্তব্ধ করিয়া কোন এক তুরীয় লোকে চলিয়া যাইতে চাহেন। জাগ্রত অবস্থাকে হেয় মনে করিয়া তাহাকে বিস্মরণ করিয়া তিনি আপনাকে ঢাকিয়া রাখেন স্বপ্ন বা সুষুপ্তির মধ্যে।

৪

মার্গত্রয়ী—জ্ঞানযোগ

রাজযোগের পরবর্ত্তী স্তরে হইতেছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই যোগত্রয়। ইহাদের ক্রিয়া রাজযোগের ন্যায় অন্তঃকরণের সবখানি লইয়া নহে। মনের যাবতীয় প্রকরণ নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করিতে ইহারা চেষ্টা পায় না। ইহাদের লক্ষ্য মনের যে প্রধান তিনটি গতি তাহার কোন একটি ধরিয়া তাহারই সহায়ে সমস্ত মানুষটিকে পরিবর্ত্তন করা। সমস্ত মানুষটিকে চারিদিক হইতে ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার অন্তরের মূল বস্তুটি ধর, তাহার কেন্দ্রস্থলে আঘাত কর, দেখিবে কত সহজেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই মূল বস্তু, অন্তঃকরণের প্রধান ধর্ম্মরূপে লইয়াছে কেহ জ্ঞান, কেহ প্রেম, কেহ কর্ম্ম এবং সেই অনুসারে তাহাদের সাধনপন্থার নাম হইয়াছে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। মানুষের এই যে ত্রিবিধ ঈষণা সাধারণ জীবনে তাহাদের গতি স্থূলের, অল্পের, খণ্ডের দিকে, সেই দিক হইতে ফিরাইয়া উহাদিগকে সূক্ষ্মের, বৃহতের, পূর্ণের দিকে, ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে ইহা হইতেছে মার্গত্রয়ের

সাধনার মূল সূত্র। একবার যদি মানুষ তাহার বুদ্ধির কেন্দ্রে অথবা হৃদয়ের কেন্দ্রে অথবা কর্ম্মপ্রেরণার কেন্দ্রে ভাগবত স্পর্শ অনুভব করে তবে ক্রমে অব্যর্থভাবে সকল অন্যতর ক্ষেত্রগুলিই সেই স্পর্শে দিব্যপ্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। রাজযোগ ও এই মার্গ-ত্রয়ীর মধ্যে আর একটি প্রভেদও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজযোগ শরীর ও মনের সংমার্জ্জন ও সংশোধনের উপর যতখানি জোর দেয়, ভাগবত সত্তার অধিকারী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শরীর ও মনকে যত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া, নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুদ্ধ, সিদ্ধ, পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায় মার্গত্রয় তাহা কিছুই করে না। আসন, প্রাণায়াম বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ এ সকল প্রক্রিয়া মানুষকে জোর করিয়া করিতে হয়, বাহির হইতে আপনার উপর কি একটা আরোপ করিতে হয়—ইহাদের মধ্যে কেমন কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার আভাস মিশ্রিত হইয়া আছে। মার্গত্রয় বলে, মানু-ষকে লও মানুষ হিসাবে, তাহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়। মানুষ চায় জানিতে, ভালবাসিতে, কর্ম্ম করিতে—এই তিনের সাহায্যে কি করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহাই বিচার্য্য। শরীর ও মনের সে কঠিন ব্যায়ামের কসরতের প্রয়োজন কি?

রাজযোগের প্রতিষ্ঠা চিত্ত, জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি। মানুষ জানিতে চায়, এই জানা'র প্রবৃত্তি ধরিয়া জ্ঞানযোগ। লক্ষ্য কি? ভগবান্। ভগবানকে পাইতে হইলে আগে চাই ভগবানকে জানা। ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞান নাশ করা এবং সত্যের জ্ঞান পাও-য়াই তবে সকল সাধনা। সত্যরূপী ভগবান্ হইতেছে আত্মা।

এই আত্মসাক্ষাৎকারই সকল জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের দুইটি স্তর, অথবা দুইটি ভাগ। প্রথম হইতেছে বিচার ও বিবেক। সত্যকে জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে সত্য কি নয়, ভুল কি? ইহাই বিচার। আমার সম্বন্ধে আমি যতখানি জানিতে পারি অন্য কিছু সম্বন্ধে তেমন জানা সম্ভব নয়। তাই বিচার আরম্ভ আমাকে দিয়া। আমার মধ্যে সত্যবস্তুটি কি? তাহা কি দেহ? না। প্রাণ? না। মন? না। কারণ এ সকলই নশ্বর, চঞ্চল, ক্ষণিক। সত্য অর্থ সৎ, যাহা আছে, ছিল, থাকিবে। থাকাই যাহার ধর্ম্ম। যখন এই নেতি নেতি করিয়া ভুল প্রত্যয় সব নিরসন করি, যখন গভীরভাবে উপলব্ধি করি দেহ প্রাণ মন সত্য নয়, ইহাদের অতীতে একটা কিছু আছে যাহা অব্যভিচারী সত্তা, যাহা সৎ, যাহা সত্য তখন জাগে আমাদের মধ্যে বিবেক। বিবেক এক সহজ প্রেরণাভরে সত্যের ও মিথ্যার পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। বিচার মিথ্যা প্রতীতি খণ্ডন করিবে। বিবেক সত্যবস্তুর আভাসটি ফুটাইয়া তুলিবে—আভাস কেন না, আমার নিগূঢ় সত্য আমিত্বের যে চৈতন্য তাহা একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। বুদ্ধির দ্বারা তাহার ভাবমূর্ত্তি পাই মাত্র। এই ভাবকে উপলব্ধির মধ্যে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলাই জ্ঞানযোগের দ্বিতীয় ভাগ। তাহা হইতেছে এই ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া, মনে মনে গাঁথিয়া তুলা, তাহাতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া যাওয়া। জ্ঞানযোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, সত্যকে, আত্মাকে পাইতে হইলে চাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অবহিত হইয়া শুন সত্য-

মন্ত্র, সত্যের নাম, তাহার সংজ্ঞা, তাহার পরিচয়, চিন্তাকে মনকে সর্ব্বদা তাহার উপর অর্পণ কর, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া যাও। ক্রমাগত এইরূপ সেই পরম বস্তুরই কথা ভাবিতে ভাবিতে, কেবল সৎ সত্তারই প্রতীতির মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে বাহ্য প্রতীতি সব আমাদের খসিয়া পড়িতে থাকিবে, দেহ প্রাণ মনের খেলা এই মিথ্যা মরীচিকা স্তিমিত হইয়া আসিবে। ফুটিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে শাশ্বত গুহাহিত যে আত্মা। তখন সাধকের অন্য কোন চেতনা নাই, সে তখন তুরীয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখনই সে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ। জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রামের জ্ঞান হইতে নির্ব্বিশেষ মুক্তিলাভ করিয়া তাহার তখন কৈবল্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসিদ্ধি।

জ্ঞানযোগের মহৎ দান এই ব্রহ্ম, এই সচ্চিদানন্দ—সেই সৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল সত্তা, সেই চৈতন্য যাহা সকল জ্ঞানের মূল, সেই আনন্দ সুখদুঃখের মধ্যে যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ। জ্ঞানযোগ মানুষকে দেখাইতেছে তাহার গভীরতম আত্মবস্তু, সকল সীমা সকল খণ্ডতা সকল স্থূলতার অতীতে যে অনির্ব্বচনীয় পূর্ণত্ব, একত্ব, যে নিত্যসত্য, যাহা অপরিণামী, অবিসম্বাদী, শাশ্বত, সনাতন, যেখানে শোক নাই, মোহ নাই, অতৃপ্তি নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাব এইখানে যে মানুষকে তুরীয় অতীন্দ্রিয় বস্তুটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাহার ইহলোকত্রয় তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে একবারে তুচ্ছ অগ্রাহ্য করিয়াছে। দেহ প্রাণ মনে অসত্য অনৃতের খেলা আছে কিন্তু ইহারা একান্ত অসত্য অনৃত নহে। ইহাদিগকে

সচ্চিদানন্দ-বস্তুতেই গড়িয়া তুলা যাইতে পারে এ কথা জ্ঞানযোগী ধরিতে পারেন নাই। মূল সত্যকে খুঁজিতে যাইয়া সেই সত্যের যে শাখাপ্রশাখাময় ফলফুলে সুশোভিত একটা স্থূল প্রকটমূর্ত্তি আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। খণ্ডকে সীমাকে তিনি দূর করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যকেও হারাইয়াছেন। এককে পাইয়াছেন কিন্তু একেরই যে বহুত্ব তাহা হারাইয়াছেন। একীকরণ বুঝিয়াছেন কিন্তু সমীকরণ বুঝেন নাই। পূর্ণযোগের সাধক আমরা একবে চাই, কারণ একেই প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই এককে ফুটাইয়া তুলিব বহুতে, ব্রহ্মকে জাগ্রত করিব দেহ প্রাণ মনে। একের ও বহুর, ব্রহ্মের ও জগতের, অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে আমাদিগকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, উভয়ের মিলনস্থানটি, সামঞ্জস্য-তত্ত্বটি আমাদেব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগীর ভুল এইখানে তিনি নিজের অস্মিতার মধ্যেই ব্রহ্মকে প্রকট দেখিতেছেন, একান্তভাবে সেখানেই ব্রহ্মকে উপ-লব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু নিজের সত্তাকে জগতের কেন্দ্ররূপে না দেখিয়া, জগতের অন্যান্য বস্তুকে নিজের চৈতন্যের ছায়া বা মায়াখেলারূপে না গ্রহণ করিয়া, যদি অপরের সত্তার মধ্যেও আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে একই ব্রহ্মের পূর্ণ স্থিতিটি সাক্ষাৎ করি তবে জগতের বাহিরে নয়, জগতের ভিতরেও এই ব্রহ্মকে পাইব। সকল দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের উপলব্ধি দ্বারা বুঝিব

জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবাদী কল্পিত সে ব্যবধান নাই।

বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্তার যে চৈতন্য জ্ঞানযোগী কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম্ম যে প্রকাশ, বিকীরণ, বিস্ফুরণ অর্থাৎ শক্তি তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—চিৎ আর তপঃ একই বস্তু এবং এই তপঃ হইতে সৃষ্টি। শুধু চৈতন্যের দিকেই তিনি জোর দিয়াছেন বলিয়া তিনি পাইয়াছেন নিষ্ক্রিয় বা অক্ষর ব্রহ্ম। কিন্তু চৈতন্যের অন্তরে যে প্রকাশাত্মিকা প্রেরণা যে উদ্‌গমনশীল শক্তি—স পর্য্যগাৎ—লুক্কায়িত তাহার উপর ধ্যান দিলে আমরা দেখিব ব্রহ্মই কর্ম্মপর হইয়া উঠিয়াছেন, অচল স্থাণুই আপনার অচলত্ব স্থাণুত্ব অব্যাহত রাখিয়া গতির মধ্যে পরিণামের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই স্বরূপ সত্তা হইতে এই জগৎ বিচ্ছুরিত, তাহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সচ্চিদানন্দের পরম শান্তিকে ধরিয়াই বিশ্বের শক্তি চঞ্চল, নিত্য লীলায়িত। জ্ঞানযোগ যদি আমরা এইভাবে সাধনা করি তবে একমেবাদ্বৈতং শান্তং শিবং সুন্দরং জগতের প্রতি বস্তুতে, প্রতি গতিভঙ্গিমায় পরিস্ফুট দেখিতে পাইব। আমাদের চিন্তা আমাদের ভোগ আমাদের কর্ম্মজীবন-কেও অন্তরের একটা প্রসন্নতা, বিমলতা, স্বচ্ছতা, শান্তির, মুক্তির প্রদীপ্ত চৈতন্য, অখণ্ড জ্ঞানের উপরেই খেলাইয়া তুলিতে পারিব। তখন সাধারণ জীবনকে আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না, জগ-তের কর্ম্ম হইতে আর দূরে থাকিতে হইবে না, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মিস্থিতিরই স্ববলয়িত লীলাবিতান করিয়া গড়িয়া তুলিব।

৫

মার্গত্রয়ী—ভক্তিযোগ

জ্ঞানযোগ মানুষকে তাহার মস্তিষ্ক, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যকে জানিবার প্রেরণার মধ্য দিয়া সমুন্নত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। ভক্তিযোগ লইয়াছে মানুষের হৃদয়, ভালবাসিবার বৃত্তি, সুন্দরের প্রতি আসক্তি। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য ব্রহ্ম, তুরীয় চৈতন্য। ভক্তের লক্ষ্য ভগবান্, তুরীয় আনন্দ। জ্ঞানীর পন্থা আত্মোপলব্ধি, আপন স্বরূপকে, সত্যসত্তাকে জানা, চেনা, নিজের 'আমিটিই' হওয়া। ভক্তের পন্থা আত্মসমর্পণ, প্রণতি—'আমি'কে 'তুমি'র হাতে ধরিয়া দেওয়া, 'আমার' মধ্যে 'তোমাকে' মিলাইয়া আনন্দে তৃপ্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা। ভক্ত বলেন প্রেমতৃষ্ণা অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবলতর বৃত্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে মানুষ কর্ম্ম করে কিন্তু সে সকল যেন বাহিরের অঙ্গমাত্র। হৃদয়ই তাহার কেন্দ্রস্থল, হৃদয় দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত। মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, বৃহত্তর সত্তার সহিত তাহাকে পরিচিত করাইতে হইলে এই ভালবাসার টানের মধ্য দিয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ। মানুষ ভালবাসিতে চায় মানুষকে, মানুষের স্থলে স্থাপন কর ভগবান্—ভালবাসার পাত্রটি শুধু পরিবর্ত্তন কর, দেখিবে মানুষ কেমন কত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষ খুঁজিতেছে ভালবাসার পূর্ণ তৃপ্তি—কেবল মানুষে তাহা সম্ভব কোথায়? কিন্তু

ভগবান্ যে পূর্ণ প্রেম, অখণ্ড ভোগমূর্ত্তি, পরম সুন্দর। ভগবানকে এই ভাবে দেখিয়া, নিজেরই অন্তরের সমস্ত ভালবাসার নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে রসরাজ তাঁহাতেই একান্তচিত্ত হইয়া ডুবিয়া যাও। ঈশ্বরে পরানুরক্তি ইহাই সব সাধনার মূল কথা। এই অনুরাগ যাহার হইয়াছে তাহার চিত্তশুদ্ধিও হইয়াছে, তাহার মুক্তিলাভও হইয়াছে।

ভক্তিযোগ ভগবানকে মানুষের অতি গোচর অতি আপনার করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। মানুষ চায় নিজেরই অনুরূপ সামগ্রী কিছু, নিজের মতনই যাহা যতখানি তাহার সহিত ঠিক ততখানিই সে মিলিত হইতে পারে। ভক্তিযোগে মানুষ তাহার সেই অতীন্দ্রিয় বা তুরীয়, সেই মহত্তর বৃহত্তর আদর্শটি হইতে আপনাকে আর দূরস্খলিত বলিয়া বোধ করে না। কারণ ভক্তিযোগ মানুষকে খুব মানুষভাবেই দেখিয়া তবে তাহার সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছে। নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া মানুষ এই জগতে—নানা ভালবাসার পাত্রে আপনার হৃদয়-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি এইরূপ ভালবাসার নানা সম্বন্ধ সে পাতিয়াছে। ভক্তিযোগ বলিতেছেন ভগবানকেও এইরূপ যে কোন ভাবে তুমি পাইতে পার। তিনি একটা অদ্ভুত বা অনধিগম্য পদার্থ কিছু নহেন। তিনিই "পিতেব পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ"। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের রসের এই পঞ্চধা ভাব। এই সকল ভাবই হৃদয়ে রাখ। এবং যে ভাবেই

তুমি ভরপুর থাক না কেন মানুষের দিক হইতে ফিরাইয়া কেবল তাহাকে ভগবানের চারিদিকে ফুটাইয়া তোল। ভক্তবীর হনুমান, অর্জ্জুন, যশোদাদেবী, শ্রীরাধা এইরূপ এক এক ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গ আবার এ কথাও বলিয়াছেন যে শুধু অনুকূল ভাবে নয় প্রতিকূল ভাবেও, শুধু মিত্রভাবে নয় শত্রুভাবেও ভগবানের সাধনা করা যাইতে পারে, ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। কোন জিনিষ অধিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ অতি তীব্র সম্বন্ধ স্থাপন করা। মিত্রভাবের ন্যায় শত্রুভাবেও এইরূপ একটা তীব্র সম্বন্ধ। মিত্র যেমন আমাদের কাছে পরিস্ফুট গোচর, শত্রুও ঠিক তেমনি পরিস্ফুট গোচর, তাহার অস্তিত্ব আমাদের অন্তরে তেমনি জাজ্বল্যমান। ভগবানকেও এইরূপ শত্রুভাবে দেখিয়া, তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি মিত্রভাব অপেক্ষা, শত্রুভাব অনেক সময়ে সাধকের পক্ষে আশু ফলপ্রদ। কারণ শত্রুভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরের যত অশুদ্ধতা, বিকৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা সব একত্রিত একমুখী বিপুল হইয়া উঠে। এবং যখন এই বিরাট স্তূপটি ভগবানের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়—তখন তিনি একযোগে একটি আঘাতে সে সমস্তখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার সুবিধা পান। মিত্রভাবে কিন্তু ভগবানকে সাধকের প্রতি অঙ্গ হইতে অবিরাম খুঁটিয়া খুঁটিয়া তবে দোষগুলি দূর করিতে হয় এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। সেইজন্যই বোধ হয়

কথিত আছে মিত্রভাবে মুক্তি সাত জন্মে, শত্রুভাবে মুক্তি তিন জন্মে মাত্র। বিদ্বেষ প্রণয়েরই উল্টা দিক। ঘোর বিদ্বেষকে প্রণয়ে সহজেই পরিণত করা যায়। কিন্তু উদাসীনতা যেখানে সেখানে এই প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করা দুরূহ।

ভগবান্ শুধু অতীন্দ্রিয় অদেহী সচ্চিদানন্দ নহেন। জগতের স্থূলরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়াদির খেলার মধ্যে ভগবানেরই আনন্দ স্বরূপ মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। ভক্তিযোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু, সে সকলকে ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং সকলের প্রতিষ্ঠান এই দেহ এই জগৎ—সবই সত্য ও নিত্য। ইহাদের প্রত্যেকের একটি সত্য সত্তা আছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ আছে। তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি যেখানে তাহাই ভগবান্। স্থূলের যত প্রকাশ যত বিভব সবই ভগবানের মধ্যে আছে এবং সম্পূর্ণভাবেই আছে। আছে বলিয়াই বাহিরে তাহাদের এই বিকাশ। ভগবান্ তাই সকল ঐশ্বর্য্য সকল বীর্য্য সকল শ্রীর আধার—তাঁহাতেই সকল 'ভগ', তাঁহাতেই সকল ভোগ, সকল রস, সকল আনন্দ। স্থূল বস্তুর স্থূল বিকাশের মধ্যে রহিয়াছে যে ভাগবত বস্তু ভাগবত বিকাশ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহার রসে মজিয়া যাওয়াই ভক্তের লীলা।

ভক্ত জগৎকে অস্বীকার করেন না, জগৎকে তিনি ভগবানেরই নিগূঢ় লীলার বাহ্যমূর্ত্তি, ভগবানেরই রাসলীলার স্থূল আশ্রয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দেখেন। কিন্তু এই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ

তাহা সাক্ষী অথবা উদাসীন রসগ্রাহকের সম্বন্ধ মাত্র। ভাগবত আনন্দে তিনি গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত তপঃশক্তি মানুষকে শুধু (passive) ভোক্তা নয়, (active) কর্ত্তা হইতে নিযুক্ত করিতেছে তাহা তিনি অনুভব করেন না। ভক্ত জগতে যাহা যেমন আছে বা হয় তাহাতেই সমরসাত্মক এক বিপুল আনন্দের ঘোরে মগ্ন। এই আনন্দের খেলারও যে একটা বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ গতি, বিশেষ প্রণালী আছে মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবে, কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে বিরাট করিয়া তুলিবে—তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। জগৎ তাঁহার চক্ষে তাই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবের কুয়াসায় আবৃত, উহা জাগ্রত বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না। ভাবপ্রবণতার সহজ মাদকতার নেশায় মজিয়া ভক্তির সাধক সাধারণ জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়েন। ভক্তিমার্গের ইহাই অভাব।

ভগবানের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ একেবারে অতীন্দ্রিয়ে, সৃষ্টির বাহিরে। ভক্ত সেই সম্বন্ধটিকে স্থূলতর মানুষের নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। সৃষ্টির ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের ইহাই বিশিষ্টতা। জগৎ লইয়া, মনুষ্যজাতি লইয়া যে সিদ্ধ জীবন, যে দিব্য সাম্রাজ্য তাহার একমাত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই প্রেম, ভাগবত প্রেম। মানুষে মানুষে, শুধু মানুষে মানুষে কেন, মানুষে ও সৃষ্টপদার্থ মাত্রেরই মধ্যে যে একটা আনন্দের সামঞ্জস্যের মিলনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সে মিলনের খেলার সম্ভাবনা দেখাইয়াছে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ আরও

বলিতেছে, মানুষের যে রূপতৃষা, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয় পরিচালিত জীবন তাহার মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছা লুকায়িত, তাঁহারই আনন্দ স্ফুরিত। তাই এ সকলকে ছাড়িয়া দিয়া নয়, কিন্তু ইহা-দিগকে ভগবানের মধ্যে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াই দিব্য-জীবন পাওয়া যাইতে পারে।

৬

মার্গত্রয়ী—কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগী কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে আরও বাস্তব, আরও প্রকট করিয়া দেখেন। ভগবান্ আত্মামাত্র নহেন, শুধু ভোক্তাও নহেন, তিনিই আবার নিয়ন্তা, ঈশ্বর। তিনিই বিরাট কর্ম্মী—এ কর্ম্মশীল জগৎ তাঁহারই বিরাট অঙ্গ সঞ্চালনা। ভগবানের যে স্পষ্টতম স্থূলতম প্রকাশ, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ যাহার সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, যাহা ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই কর্ম্মরাজীর মধ্য দিয়া কর্ম্মযোগী ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহেন। কর্ম্মযোগে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জীবনের প্রতি কর্ম্ম, যে অবস্থায় যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সাধক থাকুক না কেন তদুচিত প্রত্যেক কর্ত্তব্য করিতে হইবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মটি পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে হইবে। কারণ মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে অহংকারবিমূঢ় হইয়া, এই অহংকারই

তাহার ও ভগবানের মধ্যে একমাত্র অন্তরায়, এই অহংকারের দেউলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই তাহাকে অনন্তের বৃহৎ বিসারে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই নিজের জন্য নয়, নিজের লাভালাভ, সুখ-দুঃখ, জয়পরাজয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া, শুধু কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম, ভগবান্ চাহিতেছেন তাই করিতেছি—এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের ভিত্তি হইতেছে এই ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামতা। তারপর এই আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামভাব যখন পূর্ণতর দৃঢ়তর হইয়া উঠে তখন ফলাফলের জন্য কোন অপেক্ষা ত থাকেই না, কর্ত্তব্যের জ্ঞান কর্ম্মের উপর অধিকারও মুছিয়া যায়। আমার করণীয় অকরণীয় কাজ বলিয়া কিছু নাই, আমার উৎসর্গ করিবার কিছু নাই, কারণ আমি নিজে কিছু করিতেছি না। ভগবানই আমার দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম করিয়া লইতেছেন। তাঁহারই বিরাট শক্তি তখন সাধকের মধ্যে আবির্ভূত হয়, সাধক তখন স্বতন্ত্রতাবিহীন যন্ত্রটির মত ভগবানের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া চলে, বাত্যামুখে তদ্‌গতপ্রাণ পত্রটির মত ঘুরিয়া চলে। আমি তখন কর্ত্তা নহি। আমি দ্রষ্টা, পুরুষ দেখিতেছে মাত্র, প্রকৃতিই সব করিতেছে। শেষ অবস্থা তখন যখন ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণ প্রেরণা সাধকের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া চলে। তখন আমি বোধ নাই। আমার দৃষ্টি নহে, ভগবানের দৃষ্টি। আমি মিশিয়া গিয়াছে পরমপুরুষে, এ দেহ মন প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে দিব্য প্রকৃতিতে। পরমপুরুষের ঈষণাতেই চলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গ্রথিত আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। ভগবান্

তখন শুধু আমার সংস্কারগত প্রেরণা ধরিয়া, আমাব পারিপার্শ্বিক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অনুসারেই কর্ম্ম করেন না, উহাদের মধ্যেই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। তিনি নিজের অলৌকিক ঐশী-শক্তির দ্বারা তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রেরণার মধ্যে নূতন কর্ম্ম ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মযোগী কর্ম্ম কবেন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য। জীব বদ্ধ, কারণ তাহার কর্ম্ম আছে। কর্ম্মের নাশেই তবে নিঃশ্রেয়স কৈবল্য। তবে কর্ম্মের নাশ সম্ভব কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া নয়। কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু অহংকারের দ্বারা কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। তাই যে কর্ম্ম কর সবই ভগবানের যজ্ঞমূর্ত্তিতে আহুতি-প্রদান কর। এই-রূপেই সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভিতরে কর্ম্মের বীজ নষ্ট হইলেও যতদিন দেহ থাকে ততদিন পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেরণা বশতঃ দেহ কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াই চলে। কিন্তু এ দেহও শেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে, পঞ্চভূতের বন্ধনটুকুও তখন টুটিয়া যায় তখন তুমি চলিয়া যাও তোমার স্বরূপে, আর তোমাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না। তখনই তোমার পূর্ণ সিদ্ধি। সাধারণ কর্ম্মযোগীর ইহাই আদর্শ।

কিন্তু কর্ম্মযোগকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়া না লইলেও লইতে পারি। কর্ম্ম স্বয়ং কিছু বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ অহংকার ও অজ্ঞানতা। কর্ম্ম ভগবানেরই স্বরূপ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। চিৎশক্তির দ্যুতিই যে কর্ম্মে বিলসিত, ভাগবত আন-

সেই কর্ম্মে লীলায়িত। অহংকার বিনাশ কর, অজ্ঞানতা দূর কর, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মও যে বিনষ্ট দূরীভূত হইবেই তাহা নয়। কারণ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরও সত্য ও গভীরতর প্রদেশে। প্রকৃত কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বরং ইহাই শিক্ষা দেয়, অহংকার অজ্ঞানতা ভিতরের ময়লা দূর হইলে কর্ম্মের স্রোত শুদ্ধতর বিপুলতর হইয়াই ছুটিয়া বাহির হয়। মুক্তির পরেই বস্তুতঃ যথার্থ কর্ম্ম সম্ভব, ভিতরে ব্রাহ্মীস্থিতিকেই অব্যাহত রাখিয়াই বাহিরে কর্ম্মজীবনের বিরাট খেলাটি সৃষ্টি করিয়া চলিতে পারি। তখন যে কর্ম্ম করি তাহা আমার অন্তরাত্মার তুরীয়ের ভাগবত প্রতিষ্ঠার কর্ম্ম—স্থাণু মুক্ত অনন্ত সত্তাকে পশ্চাতে জাগ্রত রাখিয়া যে সচল শক্তি প্রকট হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব দুইটি কারণে মার্গত্রয়ী আমাদের পূর্ণ সন্তোষ দেয় না। প্রথমতঃ ইহাদের লক্ষ্য শুধু আধ্যাত্মিকতার, স্বরূপের নগ্নতা। অধিভূত যাহা, রূপ যাহা, তাহার পরিপূর্ণতাও যে আধ্যাত্মিকতা এ কথা ইহারা ধরিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মানুষের এই তিনটি বৃত্তি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ বলিয়া পৃথক পৃথক পন্থা নির্দ্দেশ করা কৃত্রিমতার সৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানী যে ঈশ্বরে পরানুরক্তি তার আপনা হইতেই হয়। এবং ভগবানকে যে ভালবাসিয়াছে জ্ঞান তাহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানের, প্রেমের সার্থকতা কর্ম্মের মধ্যে—কর্ম্মী যিনি তাঁহার কর্ম্ম বিধৃত জ্ঞানের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে। পূর্ণভাবের সাধক জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যুগপৎ

চাহেন, আপনাকে কাটিয়া ইহার কোমটিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বা ইতর স্থান দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

বিভিন্ন যোগপন্থার বিশেষ গুণ কি তাহা আমরা দেখিলাম, অভাবই বা কোথায় তাহাও দেখিয়াছি। আমরা এখন কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? আমাদের অন্তর বাহিরের সকল স্তর, আমাদের সকল সত্তা সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি চাই। ভগবানকে আমরা সর্ব্বতোভাবে চাই, স্বরূপের নগ্নত্বে তাঁহাকে চাই, রূপের ঐশ্বর্য্যেও তাঁহাকে চাই। এই উদ্দেশ্যকল্পে হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পন্থারই কিছু না কিছু দান করিবার আছে। তবে কি সকলগুলিই আমাদিগকে যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে? কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। পন্থাগুলিকে এত বিভিন্ন প্রকৃতির করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রত্যেকের আছে আপন আপন বিশেষ নিয়ম, বিশেষ প্রক্রিয়া, তাহারা এমন পরস্পর বিরোধী, এত সূক্ষ্ম, এত জটিল, যে সবগুলিকে অভ্যাস করিতে গেলে আমরা এক বৃহৎ অপায়ের সৃষ্টি করিব মাত্র। একটির পর একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সবগুলি যে আয়ত্ত করিব তাহাও সম্ভব নয়। এক জীবনে ত নয়, বহু জীবনেও তাহা সুদুষ্কর।

আমাদিগকে এমন একটি তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে যেখানে সকল পন্থার সামঞ্জস্য, এমন একটি সূত্র ধরিতে হইবে যাহাতে সব পন্থাগুলিরই গূঢ়তম রহস্য বিধৃত। এমন বস্তু যদি কিছু পাই তাহাই আমাদের আদর্শের উপযোগী। যোগমার্গাবলীর বাহ্য অঙ্গগুলি আমরা পরিত্যাগ করিব, অবান্তর ঠাট যাহা তাহা দূরে

রাখিব। এমন একটি সজীব সত্যকে ধরিব যাহা সকল পন্থার প্রাণ, যাহা সকলকেই পূর্ণতায় ভরিয়া ধরিতে পারে। এই মূল সত্যটির আলোকেই আমরা বুঝিতে পারিব কোন্ পন্থার কতটুকু গ্রহণ করিতে হইবে, কতটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠিক কি ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে।

৭

বৈদান্তিক যোগ ও তান্ত্রিক যোগ

সাধারণ প্রচলিত যে যোগপন্থাসকলের বিবরণ দিয়াছি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব সে সকলেরই অন্তরালে একটি মূলভাব রহিয়াছে—আপাততঃ তাহাদিগকে যতই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হউক না কেন। যে মূলবস্তুটি আশ্রয় করিয়া এই সকল সাধনপন্থায় চলি তাহা হইতেছে জ্ঞান। এবং এই জন্য উহাদিগকে বলা যাইতে পারে বৈদান্তিকমার্গ। জ্ঞানযোগী হউন, ভক্তিযোগী হউন আর কর্ম্মযোগীই হউন সকল সাধকের নির্ভর হইতেছে জ্ঞান, মূলতঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য ও উপায়রূপে ধরিয়া তাঁহারা চলেন। জ্ঞানীর বিচার বিতর্ক জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র—এ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিতে। কিন্তু ভক্ত বা কর্ম্মীর জ্ঞান তর্কবুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও তাহা জ্ঞানই। ভক্তের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে হৃদয়ে—সে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। আর কর্ম্মীর জ্ঞান তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে, এই জ্ঞানই ইচ্ছাশক্তির

ভিতর দিয়া কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। রাজযোগ, হঠ-যোগেরও অন্তরালে রহিয়াছে এই জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এ সকল যোগে পুরুষই সাধক, আত্মাই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তারূপে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, সেই স্থির করিয়া দিতেছে কি রাখিতে হইবে, কি বর্জ্জন করিতে হইবে, আধারকে কেমন সাজাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষই হইতেছে লক্ষ্য—এই চৈতন্যময় আত্মসত্তার সহিত মিলিত হওয়াই যোগসিদ্ধি।

কিন্তু ভারতবর্ষে আর এক প্রকার যোগ প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের উপর নহে, পুরুষ তার নিয়ন্তা নহে। তান্ত্রিকযোগে সাধক হইতেছে প্রকৃতি, উপায় হইতেছে শক্তি। যে সাধনায় পুরুষ হইতেছে সাধক আর জ্ঞানই উপায় তাহার মূল-কথা উদাসীনতা, জগতের খেলা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা, সরাইয়া ফেলা। তান্ত্রিক কিন্তু এই খেলাকেই জড়াইয়া ধরিয়াছেন, প্রকৃতির নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে আদ্যাশক্তি, যে তপঃশক্তি তাহারই অদম্য বলে, তাহারই স্ব-ঈরিত পন্থায় তিনি চলিয়াছেন। বৈদা-ন্তিক প্রকৃতিকে জানেন মায়াময়ী বলিয়া। প্রকৃতি অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল, ইহার মধ্যে যতটুকু চেতনার ছায়া তাহা পুরুষের সংস্পর্শে। তাই বৈদান্তিক সাধক প্রকৃতির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাবিত বিকশিত হইতে দেওয়াও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতিকে জানেন চিন্ময়ী বলিয়া। তাই তাঁহারই প্রেরণায় সম্পূর্ণ ভর করিয়া চলিতে তান্ত্রিকের এতটুকুও ইতস্ততঃ নাই। বৈদান্তিকের উদ্দেশ্য

প্রকৃতির ছায়াপাত হইতে পুরুষকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত করিয়া লওয়া। তান্ত্রিক প্রকৃতিকে জগৎশক্তির সমস্ত খেলাকেই সত্য বলিয়া আনন্দপূর্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাই প্রকৃতিকে তিনি পুরুষেব উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শক্তিকেই অধ্যাত্মজীবনের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করিয়াছেন।

সাধারণ জীবনের যে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা, আধারের যে অসামর্থ্য মলিনতা তাহাকে দূরে রাখিয়া নিগ্রহ করিয়া, তাহার দিক হইতে সকল মনোযোগ ফিরাইয়া জীবনের, আধারের অন্তরালে অতীতে যে স্থাণু নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ অদ্বৈত জিনিষটি আছে ধ্যানে, মনের একাগ্রতায় তাহাকেই জাজ্বল্য করিতে চাহিয়াছেন বৈদান্তিক যোগী। তান্ত্রিক বলিতেছেন জীবনের পূর্ণতার উৎস জীবনের মধ্যেই, আধারের শুদ্ধির কারণ আধারের মধ্যেই আর কোথাও নয়। তান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি মৌলিক তত্ত্ব পাইয়াছেন যাহার প্রাণ,অদম্য বল, অনন্ত শক্তি, অব্যাহত কর্ম্মপ্রেরণা—ইহাই আবার শুদ্ধ পূর্ণ চেতনাদীপ্ত। জীবনকে, আধারকে, জীবনের আধারের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তর্জ্জনীসঙ্কেতে জীবনের কর্ম্মবহুল ভোগবহুল বিক্ষুব্ধতার, আধারের সকল প্রাকৃতপ্রেরণার মধ্য দিয়াই চালাইয়া তিনি গড়িয়া লইতেছেন।

বৈদান্তিক সাধনার বিষয় সৎ, উপায় বৈরাগ্য। তান্ত্রিক সাধনার বিষয় তপঃ শক্তি, উপায় ভোগ। বৈদান্তিক পুরুষকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন, তান্ত্রিক প্রকৃতিকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক, এই যে সৎ'এর বিরুদ্ধে

শক্তিকে, শক্তির বিরুদ্ধে সৎকে দাঁড় করাইয়াছেন ইহাতে তাঁহারা উভয়েই সত্যের অর্দ্ধেকটুকু পাইয়াছেন মাত্র। বৈদান্তিক শক্তিকে হারাইয়া সৃষ্টির ভোগের আনন্দবিরহিত সাধুসন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তান্ত্রিকও তেমনি সৎকে হারাইয়া প্রকৃতির উন্মার্গগামী স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অনাচারকলুষিত ভৈরব ভৈরবীর জন্ম দিয়াছেন। বৈদান্তিক যেমন ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন, তান্ত্রিকও ভোগকে ভোগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা উপায় বা সহায়মাত্র উভয়ে তাহাকেই লক্ষ্যের অধিক করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎ ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, এমন কি ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাদের একটি যে উপরে আর একটি যে নীচে তাহা নয়, উভয়েই সমান পর্য্যায়ে। পূর্ণযোগের যে সামঞ্জস্য তাহার মূল এইখানে। পূর্ণযোগীর চক্ষে আত্মা বা পুরুষ হইতেছে ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই আপন কর্ম্মনিষ্পাদনী শক্তি। পুরুষ অথবা সৎ হইতেছে শুদ্ধ অখণ্ড অসীম আত্মসত্তা। শক্তি হইতেছে চিৎশক্তি—ঐ শুদ্ধ সত্তারই চেতনার প্রেরণা, খেলা। স্থিতি ও গতি, বিরাম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ, উহাদের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ। শক্তি বা কর্ম্মপ্রেরণা যখন শুধু থাকা, শুধু অস্তির চেতনায় যে আনন্দ তাহার মধ্যেই বিলীন, তখন হইতেছে স্থিতি বা বিশ্রাম। ইহারই অপর নাম ত্যাগ। আবার যখন পুরুষ আপন শক্তির বহুবিধ কর্ম্মে আপনাকে ছড়াইয়া দিতেছেন, তখনই কর্ম্ম, তখনই সৃষ্টি, তখনই

'থাকা' নয় 'হওয়া'র আনন্দ। আর ইহাই ভোগ। এই যে হওয়ার আনন্দ ইহাই সৃষ্টির, জাগতিক প্রকাশের প্রসূতি, মূল কারণ। আর যাহার সহায়ে যে উপায়টিকে ভর করিয়া আনন্দ বস্তুরাজী সৃষ্টি করিতেছে, এক বহু হইতেছে তাহাই তপঃ।

এই তপঃশক্তি পুরুষেরই চিৎশক্তি অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ যখন আপন শুদ্ধ সত্তার মধ্যে নিগূঢ় অব্যক্ত অনন্ত রূপসম্ভাবনীয়তার উপর আপনার চেতনাকে খেলাইয়া তুলে তখনই উদ্ভূত হয় বস্তুর ভাবময় স্বরূপ, ব্যষ্টির বিশিষ্টের ঋতময় সত্যময় অন্তরাত্মা—যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অথবা সত্যভাব সকল জ্ঞান সকল শক্তির আধার যে আত্মসত্তা তাহা হইতে নিসৃত হই-তেছে বলিয়া আপনাকে অব্যর্থরূপে পরিপূর্ণ করিতে চলিয়াছে। আমাদের দেহ প্রাণ ও মনের অন্তরালে রহিয়াছে এই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। এই বিজ্ঞানই আবার এক নৈসর্গিক প্রেরণাবলে দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়া আপনাকে জাগরূক করিয়া ধরিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল যোগ সাধনারই প্রতিষ্ঠা এই চিৎভাব এই বিজ্ঞান এই সত্যং ঋতং বৃহৎএর অপ্রত্যাহত কার্য্য-কারিতার উপর। সকল যোগপন্থা ইহাকেই মানিয়া চলিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এই সত্যটিকেই লক্ষ্য করিয়া কতবার বলিতে-ছেন, 'শ্রদ্ধান্বিত' 'ভাবসমন্বিত' হইয়া যে যাহা চায় সে তাহা পাইবেই, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ ভাব সে তাহাই হয়। যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

৮

পূর্ণযোগের স্বরূপ

তবে যোগের প্রথম কথা, যেখান হইতে আরম্ভ করিব তাহা হই-তেছে কি রকম ভাবে ও শ্রদ্ধায় আমরা প্রকৃতিকে দেখিতেছি। মূলতঃ আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে আপনারই শক্তির মধ্য দিয়া পুরুষের আত্মবিকাশ, আত্মচরিতার্থতা। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রকৃতির দুইটি গতি, দুই রকম খেলা। একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক আর একটি নিগূঢ় দিব্যমূর্ত্তি, একটি উপরের স্তরের আর একটি নীচের স্তরের। সাধারণতঃ যেমন ভাবে আমরা জীবন কাটাই, অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞানের অশক্তির দুঃখের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া তাহাই প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন। কিন্তু অহংকার ছাড়াইয়া, ক্ষুদ্রতা, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শক্তির আনন্দের মাঝে যখন উঠিয়া যাই তখনই পাই প্রকৃতির পরামূর্ত্তি, তাহা লইয়াই দিব্য জীবন। এই নীচের ধাপ হইতে উপরে উঠার নামই যোগ। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে। এক, নীচ হইতে যখন একেবারেই উঠিয়া যাই, প্রকৃতির অপরা খেলাটিকে নিঃশেষ বর্জ্জন করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই অথবা যখন নীচকে ইহকে শুধু পরিবর্ত্তিত পরিশুদ্ধ করিয়া উচ্চতরটির অমৃতের মধ্যে তুলিয়া ধরি।

কিন্তু যেটিই লক্ষ্য হউক না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠা এই নীচের স্তরে, কাজেই ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তবে অপরটি

পাইতে হইবে। সাধারণ যোগ সকলের লক্ষ্য ইহাকে পরিত্যাগ করা তাই তাহার পন্থা প্রাকৃত প্রেরণার দুই একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া, আর সব ভুলিয়া তাহারই সহায়ে শেষে সমুচ্চের ভগবানে মিশিয়া যাওয়া। পূর্ণযোগী কিন্তু চাহিতেছেন অপর জিনিষটী, তিনি চাহিতেছেন প্রাকৃতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লইয়া তাহারই মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিব্যের খেলা ফুটাইয়া তুলিতে। কারণ প্রকৃতির প্রাকৃত খেলার মধ্যে পুরুষের ভগবানেরই, নিগূঢ় প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অন্তর্যামীর পূর্ণ বিকাশে পূর্ণ চরিতার্থতাই হইতেছে পূর্ণ সত্য—তাহাতেই প্রকৃতির পূর্ণ সার্থকতা। তাই পূর্ণযোগী জীবনের কোন খণ্ডিত বা বিশেষ প্রকরণের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিবেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনটিই হইতেছে যোগ। জীবনের সকল বৈচিত্র্য সকল জটিলতার, যত ক্ষুদ্র যত বৃহৎ ব্যাপার সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতে হইবে যোগের মধ্যে। সাধারণ জীবনে প্রকৃতি অখণ্ডভাবে তাহার পূর্ণ ভঙ্গিমাটি লইয়াই আমাদের মধ্যে খেলিতেছে। পূর্ণযোগের সাধক তাই সিদ্ধ জীবনে প্রকৃতির পূর্ণ অখণ্ড খেলাটিই চাহেন। প্রভেদ শুধু থাকিবে এইখানে যে সাধারণ জীবনে আমরা প্রকৃতির স্থূল গতির আধার, যোগযুক্ত জীবনে আমরা হইব দিব্য প্রকৃতির আধার। আমাদের সমগ্র সত্তাটিকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরিতে হইবে ভাগবত সত্তার দ্যোতনায়।

সুতরাং উপায় হইতেছে আমাদের সমস্ত সত্তাখানিকে জাগ্রতভাবে ভাগবত সত্তার সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়া ধরা। ভগ-

যানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এইখানে, তাঁহা-রই প্রভাবে আমাদের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এক হিসাবে ভগবান্ নিজেই হইবেন আমাদের সাধনার সাধক, আমাদের অন্তরের পুরুষ, আমাদের যোগের নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া, যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন। কারণ আমরা বলিয়াছি আমরা, আমাদের জীবন, আমাদের পরিপূর্ণ সত্তা হইতেছে একটা ভাব বা তপঃশক্তির অভিব্যঞ্জনা। আমাদের অন্তরস্থিত যে দিব্য প্রকৃতি, আমরা অখণ্ডভাবে যে বস্তুটি তাহা নিহিত রহিয়াছে ঐ ভাব ঐ তপঃশক্তির মধ্যে। এই তপঃশক্তিকে যদি খেলাইয়া তুলিতে পারি তবে তাহা আপনার ভাবের চেতনাব অব্যর্থ অটুট প্রসরণে আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতিটি পরিবর্ত্তিত করিযা তাহার নিজের যে দিব্য অখণ্ড প্রকৃতি তাহাকেই সেখানে প্রতি-ষ্ঠিত করিবে। যাহা খণ্ডিত, যাহা তমসাবৃত তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইবে যাহা দিব্য যাহা সর্ব্বজ্ঞ যাহা সর্ব্বকৃৎ। এবং এই বস্তুটিই ক্রমে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত প্রকৃতিখানিকে শুদ্ধ জ্ঞানো-দ্ভাসিত বীর্য্যপরিপ্লুত করিয়া গড়িবে, সকল মানবীয় জ্ঞান, সকল নশ্বর কর্ম্মচেষ্টার পরিবর্ত্তে তাহার নিজের দৈবীলীলাটিই ফুটাইযা তুলিবে।

পূর্ণযোগের এই যে মূলকথা ভাগবত ভাব, পূর্ণ বিজ্ঞানশক্তিকে প্রকটিত করা, সাধনার দিক হইতে তাহারই অর্থ হইতেছে অহং-কার বিসর্জ্জন, অহং এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রখানি ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ

করিতে হইবে অহং-এর অতীতে যে বস্তুটি তাহার নিকটে, তাহারই বিরাট দুর্লক্ষ্য অথচ অব্যর্থ কর্ম্মপ্রেরণার নিকটে। এ সাধনমার্গ সহজও নয় সরলও নয়। এ পথে প্রয়োজন বিপুল শ্রদ্ধা, অকুণ্ঠিত সাহস আর অটুট ধৈর্য্য। কারণ ইহার তিনটি ধাপ আমরা দেখিতে পাই। যখন শেষটিতে পৌঁছিয়াছি তখনই কেবল সাধনা আমাদের কণ্টকহীন ও দ্রুতগামী। প্রথম হইতেছে অহং-এর চেষ্টা দিব্যভাগবত সেই বৃহৎ সেই পূর্ণের সংস্পর্শে আসিতে। ফলে তারপর আমাদের সমস্ত নীচের প্রকৃতিটিকে দিব্যপ্রেরণার সহায়ে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলা এবং তাহাকে সমুচ্চ ভাগবত প্রকৃতিতেই পরিবর্ত্তিত করা। আর শেষ যখন এই পরিবর্ত্তন পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, এ পথে আমরা নিজের শক্তিতে চলি না। আমরা অহংকারকে দূর করিতে করিতে চলিয়াছি, তাই ভাগবতশক্তিই অলক্ষ্যে যবনিকার ভিতর হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান গ্রহণ করিতেছে, শ্রদ্ধা, সাহস বা ধৈর্য্যের অভাব যখন তখন ইহাই আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তি যে অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে, পঙ্গুকে দিয়াও গিরি উল্লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি সন্ধান পায় একটি বিধান বা বস্তুর অন্তর্নিহিত এক ধর্ম্ম যাহার অব্যর্থ গতিই হইতেছে ভদ্রকে কল্যাণকে ঘিরিয়া। হৃদয় খুঁজিয়া পায় একজন প্রভু, একজন সখা, অথবা এক বিশ্বমাতা যিনি প্রতি পদস্খলনে আমাদিগকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। এ পথে যত বাধা যত বিপত্তি অন্য কোন পন্থায় তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু যখন স্মরণ করি ইহার লক্ষ্যটি,

ইহার প্রযাসের বিপুলত্ব—মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সকল অঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর এক ধর্ম্মে তাহাকে জগতের জীবনের কর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখা—তাহার তুলনায় তখন মনে হয় এ পথের মত সহজ পথ আর নাই, এমন অব্যর্থ সুনিশ্চিত পন্থাও আর নাই।

৯

পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী

আমাদের পরাপ্রকৃতি যখন আমাদের অপরাপ্রকৃতির উপর অখণ্ড ভাবে খেলিতে থাকে, আমাদের প্রাকৃতস্বভাবের সমস্তখানির মধ্যে যখন ভাগবত স্বভাব নামিয়া আসিতে থাকে, তখন উহা যে ভাবে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে থাকে তাহার তিনটি লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখি সেখানে যথাবিহিত অকাট্য নিয়ম বা পরম্পরা কিছু নাই। বিশেষ বিশেষ যোগপ্রণালীতে আছে ধরাবাঁধা আইন, সাধক সেখানে চলিযাছেন নিজেকে আঁটিয়া বাঁধিয়া, একটির পর একটি করিয়া স্তরের পর স্তর পার হইয়া। পূর্ণযোগের সাধক কিন্তু চলিয়াছেন একটা মুক্ত যথেচ্ছ-গতির মধ্য দিয়া। সাধনার শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে বিক্ষিপ্তভাবে, কোন বিশেষ বিধানের মধ্যে তাহা নিঃশেষ ধরা দিতেছে না, তবুও সে শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, নিগূঢ়-ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতেই সে চলিয়াছে। সাধ-

কের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, সে প্রকৃতির মধ্যে যে সব উপকরণ হই-তেছে শুদ্ধির সিদ্ধির সহায় আর যে সব অন্তরায় সেই সকল অনু-সারেই শক্তি নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। বিশেষ যোগের সাধকসকলকে চলিতে হইতেছে একই পথে একই ভঙ্গিমায়—সরলরেখায় ঋজুভাবে। পূর্ণযোগের সাধক নিজের অন্তঃস্থিত নিগূঢ় প্রয়োজনের বশে চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা উদার প্রসারের মধ্য দিয়া আপনার সমস্ত প্রকৃতিটিকে লীলায়িত বলয়িত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়া। পূর্ণযোগের প্রত্যেক সাধ-কেরই স্বতন্ত্র পথ, প্রত্যেক সাধকই স্বভাবের প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ সাধন উপায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু নাই তাহা নয়। কোন কঠিন সঙ্কীর্ণ ছাঁচের মধ্যে না ঢালিয়া ফেলিয়া, আমরা পূর্ণযোগেরও কার্য্যে একটা প্রণালী ধরিয়া দিতে পারি, পূর্ণযোগেরও একটা শাস্ত্র কিছু পাইতে পারি। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীতে রহিয়াছে কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতি, সেখানে নাই জড়যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য গতানু-গতিকতা, পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা—কিন্তু তবুও সেখানে আছে একটা নিয়ম একটা ধর্ম্ম, শুধু তাহা হইতেছে উদার সূক্ষ্ম, তাহা রহিয়াছে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্য স্বৈরাচারকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহা প্রাণের ধর্ম্ম। পূর্ণযোগের মধ্যে খেলিতেছে প্রকৃতির এই প্রাণের ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী হইতেছে পূর্ণ অখণ্ড, সাধকের সমগ্র প্রকৃতিটি লইয়া। সুতরাং আমাদের সমস্ত অতী-

ন্তের পরিণতিস্বরূপ আজ যে প্রকৃতির আধার আমরা হইয়া উঠি- য়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনীয় উপকরণই বর্জ্জিত হয় না, সবই কেবল পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাগবত সত্তায় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক জিনিষটিই এক মহাশিল্পী আপন হাতে করিয়া লন এবং বর্ত্তমানে অতি ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে যে বস্তুটিকে সে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছে, সেই বস্তুটিরই জ্বলন্ত মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলেন। আমাদের উপলব্ধি, আমাদের দৃষ্টি যতই স্পষ্টতর পূর্ণতর হইতে থাকে ততই আমরা বুঝিতে থাকি আমাদের নিম্ন- তর প্রকৃতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধার কোন্ কোন্ উপকরণে গঠিত, ততই দেখিতে থাকি উহার মধ্যে যত কিছুই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয়, বিকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে একটা সত্য, একটা ঋত, দিব্য ভাগবত প্রকৃ- তির মহাসামঞ্জস্যে যাহার স্থান ও কর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট আছে। মানব প্রকৃতির সকল স্তরের, আধারের প্রতি অঙ্গেরই আছে একটা সত্য আত্মা, সত্য ধর্ম্ম, সত্য কর্ম্ম; সে সকলই ফুটাইয়া তুলিয়া, জাগ্রতে প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূর্ণযোগ ভগবানের পূর্ণতা গড়িয়া লইতেছে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণযোগ আমাদের অন্তঃস্থিত ভাগবত শক্তি আমা- দের সমগ্রজীবনটিকেই উপায় স্বরূপ কার্য্যে লাগাইয়াছে। আমা- দের প্রত্যেক অভিজ্ঞা, বাহ্যজগতের সহিত প্রত্যেক স্পর্শ যতই অকিঞ্চিৎকর অথবা যতই বিপুল মারাত্মক হউক না কেন সকলকে ধরিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। অন্তরের প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সাধনার পথে প্রতি পদস্খলনাও আমা-

দের সহায় হইয়াছে, সিদ্ধির দিকে অব্যর্থভাবে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি ভগবান্ জগতের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, আমাদের অন্তরেও ঠিক সেই প্রণালীই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। জগতে দেখি অন্ধকারের ভিতর হইতেই আলোক বাহির করিতেছেন, দুর্ব্বলের পতিতের মধ্যেও শক্তির অভ্যুত্থানের বীজ বপন করিতেছেন, যাহা দুঃখদায়ক যাহা কষ্টকর তাহাকেও আনন্দের উৎস করিয়া গড়িতেছেন। প্রাকৃত জগতে যাহা দেখি, আধ্যাত্মিক জগতেও দেখি সেই একই লীলাভঙ্গিমা। তবে প্রাকৃতজগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে অতি ধীরে, অজ্ঞানতঃ আর অপরটিতে শক্তি ক্ষিপ্র জাগ্রত চেতনাময়, যন্ত্র যে সে চিনিয়াছে স্বীকার করিয়াছে যন্ত্রীকে প্রভুকে।

বিশ্বজীবনই হইতেছে প্রকৃতির যোগ। প্রকৃতির চেষ্টা আপনার মধ্যে নিগূঢ় ভগবানকে প্রকটিত করিবার জন্য। এই বিশ্বপ্রকৃতির আপনাহারা চেষ্টা মানুষের মধ্যে যখন সচেতন আত্মজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া উঠে, আপন উদ্দেশ্যকে যথাযথ পরিপূর্ণ করিবার সামর্থ্য যখন তাহার জন্মায় তখনই আমরা প্রাকৃতিক স্তর হইতে উঠিয়া গিয়াছি আধ্যাত্মিক স্তরে, তখন প্রাকৃতিক শক্তির স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে যোগশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি বিক্ষিপ্ত অনবয়ব স্তিমিতপ্রবাহ অথচ বিপুল সর্ব্বব্যাপী তাহাকেই সংহত সুবিন্যস্ত চক্ষুষ্মান্ করিয়া কার্য্য করিতেছে পূর্ণযোগশক্তি।

১০

পূর্ণযোগের ফল

পূর্ণযোগের সাধন-প্রণালীটি যেমন পূর্ণ অখণ্ড, তাহার ফলও তেমনি পূর্ণ অখণ্ড।

প্রথম হইতেছে ভাগবত সত্তার পূর্ণ অখণ্ড উপলব্ধি। ভগবানকে পূর্ণরূপে পাইয়াছি অর্থাৎ তাঁহার যে ভেদহীন অদ্বিতীয় একত্ব শুধু সেইটুকুই নয়, কিন্তু তাঁহার যে অনন্ত রূপবৈচিত্র্য তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি—আত্মার মধ্যে যে একত্ব শুধু তাহা নয়, হৃদয়ঙ্গম করি আবার সেই একত্ব, যাহা রহিয়াছে কর্ম্মের, সৃষ্টির, জীবসকলের নানাত্বের খেলায়।

আর সেইজন্যই পূর্ণ অখণ্ড মুক্তি। শুধু সাযুজ্য মুক্তি নয়—সাযুজ্য মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা-ভেদজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধের মধ্যেও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভাগবত সত্তাকে। শুধু সালোক্য মুক্তি নয়—সালোক্য মুক্তিতে আমার চেতনা রহিয়াছে জাগিয়া সেই ভাগবত লোকে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে। কিন্তু পূর্ণযোগ দেয় আবার সাধর্ম্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ যখন আমার ও ভগবানের একই ধর্ম্ম, আমার আধারের নিম্ন স্বরূপ—তাহার সকল সত্তা, সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপেই গড়িয়া উঠে, পরিচালিত হয় ভাগবত সত্তায় ভাগবত প্রেরণায়, ভগবানই ধারণ করেন মানুষী রূপ।

এই অখণ্ড উপলব্ধি আর এই অখণ্ড মুক্তির ফল জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য। কারণ তখন অহং জ্ঞান বিলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে, তখন চেতনায় একীভূত হইয়াছি সকলের মধ্যে ও সকলকে ছাড়িয়া আছে যে এক তাহার সাথে। আর এই চেতনা এই জ্ঞান যখন খণ্ডিত নয় তখন ত সহজেই কৈবল্যের একত্বের আনন্দ যেমন উপভোগ করি, ঠিক তেমনি নানার বৈচিত্র্যের যে রস তাহাও উপভোগ করি। সত্তার সে নিগূঢ় সমুচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রেমময়ের সহিত যুক্ত হইয়া এ জগতেরই বহুবিধ সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমানন্দের আসনটি প্রসারিত করি। আর জগতকে জীবনকে যখন এইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি, অন্তরাত্মায় যখন সেই উদার মুক্তি পাই যাহা জগৎ হইতে বিমুখ হওয়ার উপর নির্ভর করে না কিন্তু জগৎকে ধরিয়াই যাহা অব্যাহত রহিয়াছে তখন ত আমার দেহে মনে সেই ভাগবত-প্রেরণাস্রোতই বহিয়া চলে, জগতে আমার মধ্য দিয়া ভাগবত কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে থাকে।

ভাগবত জীবন যাহা তাহা শুধু মুক্তিতে নয়, তাহাতে আছে আবার শুদ্ধি, ভুক্তি, সিদ্ধি। অখণ্ড শুদ্ধি একদিকে ভাগবত সত্তাটিকে সামাদের সত্তার মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া দেয় আর একদিকে সত্তার যে সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম—ঋত—তাহাকেও ফুটা-ইয়া তুলে আমার কর্ম্মজীবনের মধ্যে। যে জটিল যন্ত্র সমষ্টি লইয়া আমার আধার তাহা যতদিন শুদ্ধ না হইতেছে, যতদিন ভাগবত প্রেরণার প্রণালী না হইয়া উঠিতেছে ততদিন পূর্ণ মুক্তি নাই। আর এই শুদ্ধি যখন পাইয়াছি তখন পাইয়াছি পূর্ণ ভুক্তি—জগ-তের অতীতে যে আনন্দঘন তাহাও উপভোগ করি আর জগতে যত কিছু রূপ সে সকলেরও রসভোগ করি সেই আনন্দস্বরূপের

প্রতীকরূপে বিগ্রহরূপে। আধার শুদ্ধ হইলে, তাহার স্তরে স্তরে ভাগবত আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইলে, মানুষ হইয়া উঠে মানবধর্ম্মাবলম্বী ভগবান্—তাহাই সিদ্ধি। মানবের প্রকৃতিতে ভগবান্ তখন আবির্ভূত হন, তাঁহার সত্তায়, তাহার প্রেমে, তাহার আনন্দে, তাহার জ্ঞানে, তাহার কর্ম্মে প্রকটিত হন সেই ঈশ্বর যিনি যুগপৎ এক ও বহু, যিনি জ্ঞান ও শক্তি, যিনি সৎ ও তপঃ—মানুষ মানুষ হিসাবেই তখন পূর্ণ, সার্থক—কোন অংশকে, কোন অঙ্গকে, কোন প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্জন করিয়া নয়, সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া, আপন অখণ্ড সমগ্রতায় মানুষ তখন মহীয়ান্।

সিদ্ধির অর্থ আবার মনের সিদ্ধি ও শরীরের সিদ্ধি। সুতরাং রাজযোগের ও হঠযোগের যাহা ফল তাহাও রহিয়াছে পূর্ণযোগে। শুধু তাহাই নয়, মনের শরীরের পূর্ণ সিদ্ধিই দেয় পূর্ণযোগ, নতুবা সে যোগের পূর্ণতা নাই। তবে মনের ও শরীরের মধ্যে বিকশিত হইবে তাহাদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। মনের জন্যই মন নয়, শরীরের জন্যই শরীর নয়—আত্মার ভগবানের জন্যই মন, আত্মার ভগবানের জন্যই দেহ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে আমরা যে দেখিতে পাই তিনটি স্তর তিনটি প্রতিষ্ঠান বিকশিত হইয়াছে বা হইতেছে—স্থূল জগৎ, মানসিক জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগৎ—পূর্ণযোগই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছে। স্থূলজগৎ হইতেছে প্রতিষ্ঠা, ভিত্তিভূমি, মানসিক জগৎ হইতেছে করণ, যন্ত্র, প্রণালী আর আধ্যাত্মিক জগৎ সেই উৎস, সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য, সেই সাধ্য—যাহাকে এই অন্তঃকরণের, এই মধ্যবর্ত্তী

লোকের সহায়ে বাহিরে স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ণ-যোগ এই জগতে রহিয়া জগতেরই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অতি-জগতের অধ্যাত্ম প্রতিভাটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিতেছে।

আর এই যে অখণ্ডতা পূর্ণতা তাহা বিশ্বমানবকে লইয়া। ব্যক্তির মধ্যে যদি শুধু উহা আবদ্ধ থাকে তবে তাহা প্রকৃত পূর্ণতা হইবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ যখন পূর্ণ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছি, যখন সে ভগবান্ আমার ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনি, আমার নিজের মধ্যে যেমন আর সকল মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমনি তখন নিজের পূর্ণতা নিজের সিদ্ধি সম্ভব সকলের পূর্ণতা সকলের সিদ্ধির মধ্য দিয়াই, বিশ্বমানবের সহিত যে একাত্মতা অনুভব করিতেছি, তাহা ত অব্যর্থভাবেই আমাকে চালাইয়া লইবে আমি যে অমৃতত্ব পাইয়াছি সকলকেই তাহার অধিকারী করিয়া তুলিতে। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধির লক্ষ্য বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি।

ইহাই পূর্ণযোগ—মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতি-হিসাবে বিশ্বমানবহিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস সে সমস্তকেই দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিধৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই মহান্ আয়াসই হইবে লক্ষ্য ও ফল সকল ব্যক্তিগত সকল সমষ্টিগত সাধনার।

আর ইহাই হইতেছে সেই অন্তরের স্বর্গরাজ্যের প্রতীকস্বরূপ বাহিরেরও স্বর্গরাজ্য, পৃথিবীতে সেই কৃতযুগ যাহা সকল দেশের সকল যুগের ঋষিগণ, কবিগণ, সাধকগণ কল্পনা করিয়া আসিয়া-

ছেন। আর আমরাও আজ এই নবীন যুগের সাধক, আমরা যাহারা দেখিতেছি ভগবান্ আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন জগৎ, মানব, মানবজাতিরই মধ্যে, আমরা এই কল্পনাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছি—ইহাই যে মানুষের একমাত্র যোগ্য সাধনা।

ভ্রম সংশোধন

২২পৃষ্ঠার ১৪লাইনে পরিচালিত স্থলে পরিচিত হইবে